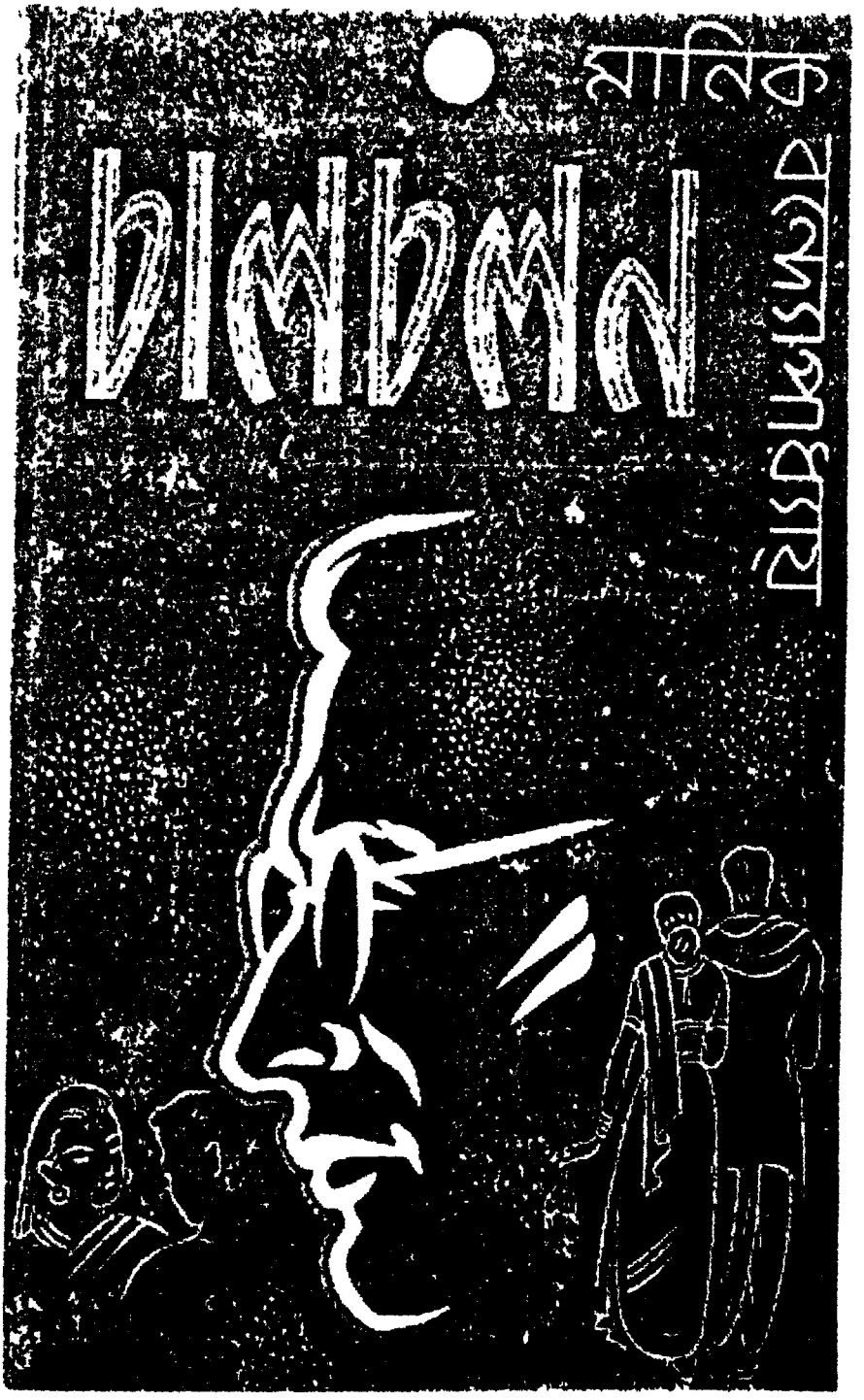

চালচলন প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

জ্যোস্নাকে ভোরের আলো ভেবে সুনীল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। ভোরের বদলে শেষরাত্রে।

ভোর শুরু হতে হতেই সে প্রতিদিন বেড়াতে যায় হয়। যখন রাত্রির অন্ধকার সবে তরল হতে শুরু করেছে অথবা রাত্রিশেষের জ্যোস্নাতে লাগতে আরম্ভ করেছে ভোরের আলোর রং।

এ বাড়িতে এত ভোরে আর কারও ঘুম ভাঙে না।

বেড়াতে বেরিয়ে সুনীল ফুল তুলে আনে। প্রতিদিন।

ভোরের শুরুতে যায় না হলে পথের ধারের পরের বাগানে পরের গাছে ফুল মেলে না। রাস্তা থেকে যে সব ডাল আয়ত্ত করা যায় একটু দেরি হলে সমস্ত ফুল লুট হয়ে ডালগুলি সাফ হয়ে যায়। তারই মতো আরও কয়েকজনের ফুল তোলার বাতিক আছে।

সুনীল কিন্তু যায় বেড়াতেই, ফুল তুলতে নয়। বেড়াতে গিয়ে ফুল তুলে নিয়ে আসে।

শুধু তুলে আনে। ফুলগুলি তার আর কোনো কাজেই লাগে না।

একে ওকে বিলি করে দেয়।

পিসি পূজা করে। ফুল দিয়েই করে। কিন্তু নিজের পূজার জন্য দরকারি দু চারটি ফুল সে নিজেই জোগাড় করে আনে। সুনীলের ফুল দিয়ে— নানারকম সুন্দর টাটকা ফুল হলেও—পিসি পুজো করে না। ম্লেচ্ছ নাস্তিকটার ফুল দিয়ে পুজো করলে নাকি অপরাধ হবে।

আমি নিজে যদি পুজো করি পিসি?

তুই করবি পুজো!

কেন? বিধিনিয়ম মন্ত্রতন্ত্র আমি সব জানি।

বেশি জেনেই তো গোল্লায় গেছিস!

রাস্তায় নেমে খানিকটা হেঁটে সুনীলের খেয়াল হয় ভোর হতে তখনও বেশ খানিকটা বাকি আছে।

খেয়াল হয় চাঁদের দিকে চেয়ে।

আগের দিন ভোরের সময় আকাশের আরও অনেক নীচে ছিল চাঁদটা। আজ বরং আরেকটু নীচে নামার কথা সেই সময়ে।

কী করা যায়? ঘড়ির দিকে একনজর তাকালেই হত, বোঝা যেত এটা রাত্রি শেষের কোন স্তর। চাঁদটাই তাকে ভাওতা দিয়েছে। বাইরে জ্যোস্না দেখে মনে হয়েছে আজ বুঝি দেরিই হয়ে গেল ঘুম ভাঙতে, কোনোদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

চারিদিক নির্জন নিঝুম। জাগবার সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে পৃথিবী যেন আরও বেশি শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেছে। বহুদূরে দু একটা কুকুরের ক্ষীণ ডাক আর বাদুড়ের পাখার আওয়াজ ছাড়া জগতে শব্দ নেই। কয়েক ঘণ্টা আগেও চারিদিক শুধু বেড়িয়ো মুখরিত করে রেখেছিল।

ইতস্তত করতে করতে সুনির্দিষ্টভাবে সময়টা জানা যায়।

কাছে এবং দূরে ঘণ্টা বাজে। তিনটি করে ঘণ্টা। রাত এখন তিনটে।

আরও দেড়ঘণ্টা তার চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমানো উচিত ছিল। তারপর ধীরেসুস্থে বেরোলেই হত।

নিজের খাপছাড়া আচরণটা সুনীলকে হঠাৎ যেন বড়োই বিব্রত করে দেয়। হঠাৎ যেন তার খেয়াল হয় যে চারিদিকে ঘরে বারান্দায় আনাচেকানাচে অসংখ্য মানুষ নির্বিচারে ঘুমোচ্ছে, শুধু একা

সে ভোরবেলা বেড়াবার ঝোঁকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে রাত তিনটের সময়। এমন নয় যে সন্ধ্যারাত্রেই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছিল, ইতিমধ্যে যথেষ্ট ঘুম হয়েছে—অন্তত তার পক্ষে যত ঘণ্টা ঘুমানো দরকার।

রাত সাড়ে এগারোটায় শুয়েছিল। রাত তিনটের মধ্যে তার ফুরিয়ে গেল ঘুমেব কারবার। বাইরে জ্যোস্না দেখে ভোর মনে করে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে !

কেন ?

কেন তার এই খাপছাড়া স্বভাব ?

নিজের অদ্ভুত আচরণের মানে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে সুনীল মনের মধ্যে নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করে। তার মনে হয়, এমন একটা কিছু গোলমাল তার ভিতরে আছে যা তাকে দশজন সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে রেখেছে। সকলে যখন ঘুমায় সে তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বেড়াতে।

এবং রাস্তায় নেমে কেন এভাবে বেড়াতে বেবিয়েছে তার মানে বুঝবার চেষ্টায় মাথা ঘামায়।

সুনীল হাঁটতে থাকে।

বেরিয়ে যখন পড়েছে আর বাড়ি ফিরে গিয়ে লাভ নেই।

নিঝুম শহরতলির নির্জন পথ ধরে একা একা হেঁটে চলতে মন্দ লাগে না। মনোজেব বাড়ির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপাশে বাড়িগুলি খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আসে।

বাঁদিকে একতলা বাড়িটার সামনে সুনীল দাঁড়ায়।

ভোরে রোজ সে বেড়াতে যাবার সময় মনোজকে ডেকে দিয়ে যায়। মনোজেব বুলাই আছে। বাইরের ঘরে জানালার কাছে মনোজ শোয়, জানালা দিয়ে হাত বাড়িযে তার নাগাল মেলে। ঠেলা দিয়ে তাকে ডেকে তুলে সুনীল আবার রাস্তায় নেমে হাঁটতে আরম্ভ করে।

মনোজ বেড়ায় না—তাকে ভোরে উঠতে হয় কাজে যাবার জন্য।

সে কাজ করে সহায়রামের কারখানায়। ঠিক ছটায় প্রথম ভোঁ পড়ে। সুনীল ডেকে দেবার পব কারখানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হবার সময়টুকুই মনোজের হাতে থাকে।

আজ এখন মনোজকে ডাকার কোনো অর্থ হয় না। বেচারা আরও প্রায় দুঘণ্টা ঘুমোবাব সময পাবে।

অথচ এমনি আশ্চর্য ব্যাপার যে প্রত্যেক দিনের মতো তাকে ডেকে দেবার কথা ভেবেই সুনীল বাড়ির সামনে দাঁড়ায় এবং নিজের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করে মনোজকে ডেকে দেবার তাগিদ।

এরই নাম কি অভ্যাস ?

এমনিভাবেই কি মানুষ নিজের অভ্যাসের বশ হয় ? কতগুলি বিষয়ে যন্ত্রে পরিণত হয় ?

হাঁটতে শুরু করে সুনীল মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করে। আজ প্রায় সাত-আটবছর সে ভোরে নিয়মিত বেড়াতে বার হচ্ছে—মনোজকে ডেকে দেবার অভ্যাসটা মোটে বছর খানেকের।

পরদিন সে বেড়াতে না বেরিয়ে দেখবে কেমন লাগে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠে সে দাঁড়ায়।

দূরে বাঁক ঘুরে একটা গাড়ি আসছে সশব্দে। মালগাড়ি বুঝতে পারা যায়। এ সময় কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন নেই।

সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়, সে একটি একটি করে গোনে মোট কতগুলি ভ্যান আছে। তারপর আবার নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন ?

অল্পবয়সে মালগাড়ি দেখলে ক-টা গাড়ি গুনবার ছেলেমানুষি শখ ছিল— আজও সেটা বজায় রয়ে গেল কী করে ? মালগাড়ি আসছে দেখে আজও সে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে পড়ে কেন, গাড়িগুলি গোনা হওয়ার পর খেয়াল হয় কেন যে এখন আর সে ছেলেমানুষ নেই, বালক বয়সের এ রকম একটা অভ্যাসের জের টেনে চলার কোনো আর মানে হয় না ?

মালগাড়ির ভ্যান গোনাটা অপরাধ নয়। যুবক বয়সে মালগাড়ির ভ্যান গুনে দেখবার কৌতূহল জাগাটা অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে এটা তার হঠাৎ জাগা খেয়াল বা কৌতূহল নয় স্রেফ ছেলেবেলার সেই অভ্যাসটার জের টানা।

একটু সময়ের জন্য সে যেন বালকে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, ফিরে গিয়েছিল মফস্বলের সেই ছোটো শহরটিতে, যেখানে রেললাইনের কাছে একটা বাড়িতে থাকার সময় এই অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা সচেতনভাবে ঘটলে সুনীল এত বিচলিত হত না। হাঁটতে হাঁটতে সে এই আত্মবিস্মৃতির মানেটা বুঝবার চেষ্টায় এতই বিব্রত আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে একেবারে বিমান ঘাঁটির কাছে পৌঁছে তার খেয়াল হয় কতটা রাস্তা হেঁটেছে।

সাড়ে চারটের ঘণ্টা পড়ে।

দেড় ঘণ্টা ধরে নিজের মনে হেঁটেছে।

হাঁটার অভ্যাস থাকায় এতটুকু শ্রান্তিবোধ করেনি।

তারাগুলি ম্লান হয়ে এসেছে। চারিদিকে দেখা দিচ্ছে জাগরণ ও জীবনের নমুনা। একঝাঁক অজানা পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। কোথায় পাড়ি জমাবে কে জানে। মনটা অদ্ভুত রকম উদাস হয়ে যায় সুনীলের। কতটুকু সময় লাগে রাত ফুরিয়ে দিন শুরু হতে, খানিক পরেই বোদ উঠবে, চারিদিক কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে— কিন্তু এতটুকু সময়কে অবলম্বন করেই যেন অনন্ত সময় আর অসীম বিশ্ব আকুল করে দিয়েছে তার অনুভূতিকে।

বড়ো ছোটো তার জীবন, তুচ্ছ সব বাঁধনে তার চেতনা পরাধীন। নিজে সে জানে না, বোঝে না। তার জীবনের অর্থ নেই।

অনুভূতিটা অসহ্য মনে হয়। বাড়ি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এতদূর এসেছে—একছুটে যদি জীবন ও জগতের সীমানা পার হয়ে চলে যেতে পারত।

বাস চলতে আরম্ভ করলে প্রথম বাস ধরে সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাস থেকে নেমেই মনে হয়, কী যেন ভুলে এসেছে, ফেলে এসেছে।

যতক্ষণ বাসে ছিল, এ ভাবটা টেরও পায়নি।

গলির মুখের দিকে এগোতে এগোতে জোরালো হতে থাকে অস্বস্তিবোধ –কী যেন ভুলে এসেছে, ফেলে এসেছে।

ভরেশ বলে, এই যে সুনীল। আজ যে বড়ো খালি হাতে ? ফুল আনোনি ?

না, আজ অন্যদিকে গিয়েছিলাম।

তাই বলো। আজ ফুল তুলে আনা হয়নি তাই মনে হচ্ছিল কী যেন ভুলে এসেছে, ফেলে এসেছে। বেড়াতে বেরিয়ে কখনও বাসে ফেরে না। তাই বাসে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কিছুই অনুভব করেনি। বাস থেকে নেমে যেই হাঁটতে আরম্ভ করেছে বাড়ির দিকে, সেই শুরু হয়েছে প্রতিদিন বেড়িয়ে ফেরার শেষ পর্যায়—সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছে খালি খালি ভাব।

শুধু তার নিজের নয়।

বেড়িয়ে ফিরছে অথচ তার হাত খালি এটা যে ভবেশ ছাড়াও কতজনের চোখে পড়ে।

মুদিখানার গগন, তিনতলা বাড়িটার একতলার ভাড়াটে শঙ্কর, স্কুলের ছাত্র বিমল, ভূপেনের স্ত্রী অনিলা এবং বোসেদের বেণু তাকে প্রশ্ন করে তার হাতে ফুল নেই কেন।

বেণুর জিজ্ঞাসা করাটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ফুলগুলি তাকেই দান করে সুনীল। বেণু এক রকম তারই বেড়িয়ে ফেরার প্রতীক্ষায় বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু বেণু ছাড়াও পাড়ার এতগুলি ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ যে তার হাতের ফুলের অভাবটা খেয়াল করে, এটা প্রায় অভিভূত করে দেয় সুনীলকে।

বাড়ি ঢুকতেই তার সাড়া পেয়ে পিসি বলে, সুনীল, আজ তোর কয়েকটা ফুল দিস তো বাবা। জ্বর নিয়ে আর ফুল তুলতে পারিনি আজ। গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে তোর ফুল দিয়েই চালাতে হবে।

আজ তো ফুল আনিনি পিসি।

তবেই দফা সেরেছিস আমার।

জ্বর নিয়ে নাইবা করলে পুজো?

কী যে বলিস তুই পাগলের মতো। আমার জ্বর বলে পুজো বাদ যাবে না কি? আর লোক নেই পুজো করার? পুজো করবে রাণী—কিন্তু এখন ফুল পাওয়া যায় কোথা।

বমেনকে বলে দাও, বাজার থেকে ফুল কিনে আনবে।

যাঃ, কেনা ফুলে কোনোদিন পুজো হয়নি, তোলা ফুল চাই।

দেখি, দু-চারটে ফুল যদি পাই।

রান্নাঘর থেকে লতা ডেকে বলে, চা খেয়ে যাও না?

ফুল এনে খাব।

বড়ো রাস্তার ধারে অবিনাশের প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ি, বাগানে বহু ফুলের গাছ—ডালে ডালে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে।

গেটে দারোয়ান বলে, ক্যা মাংতা বাবু?

কয়েকটা ফুল নেব।

নেহি বাবু। মানা হ্যায়।

সুনীল বলে, আরে বাবা, মানা তো হ্যায় জানি। তুম বরং বাবুকে বোলকে আও যে এক বাবু পূজাকা ওয়াস্তে দু চারঠো ফুল মাংতা।

গলা বেশ চড়িয়েই কথাগুলি বলে সুনীল। একটু দূরে বাগানে অবিনাশের মেয়ে মিলনী তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বোধ হয় ফুলের শোভাই দর্শন করছিল—তার কানে পৌঁছে দেবার জন্য।

পরিচয় নেই, কিন্তু বহুকাল পাড়ায় আছে, মুখ দেখে মিলনী দেবী নিশ্চয় চিনতে পারবে যে সে পাড়ায় থাকে।

মিলনী মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে এগিয়ে আসে।

কী বলছেন?

কয়েকটি ফুল ভিক্ষা চাইছিলাম। বাড়িতে পুজোর জন্য দরকার।

দারোয়ানকে কিছু ফুল তুলে দেবার হুকুম দিয়ে মিলনী বলে, আপনি সুনীলবাবু না?

সুনীল সায় দিয়ে বলে, পথেঘাটে অনেকবার দেখেছেন, মুখ দেখে পাড়ার মানুষ বলে চিনবেন ভেবেছিলাম। নামটাও জানা থাকবে ভাবতে পারিনি তো।

রেণুদির কাছে আপনার নাম শুনেছি।

রেণুদির কাছে ?

রেণুদি আমাকে পড়ায়।

ও !

দেহটা বেশ মোটাসোটা বলে এতক্ষণ তাকে রেণুর সমবয়সি মনে হচ্ছিল, এবার মুখের দিকে চেয়ে সুনীল টের পায় যে মিলনীর মুখখানা অনেক বেশি কচি—তার পক্ষে রেণুর ছাত্রী হওয়া একেবারেই খাপছাড়া ব্যাপার নয়।

মিলনী বলে, আপনি বাঁশি বাজান তো ? বেণুদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রেডিয়োতে মার্কিনি গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ রাত্রে কে বাঁশি বাজান ? বেণুদি আপনার নাম বললেন। একদিন আমরা গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, আপনি আপিস যাচ্ছিলেন। রেণুদি আপনাকে দেখিয়ে বললেন, উনিই সুনীলবাবু, উনিই বাঁশি বাজান।

রেণুর উচিত ছিল আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

মিলনী একটু হাসে।

বেণুদি বলেছিল, আমি রাজি হইনি।

কেন ?

আমি যেচে কারও সাথে আলাপ-পরিচয় করি না। বেণুদি জিজ্ঞেস করেছিল, ডাকব, আলাপ করবে ? আমি যদি সায় দিয়ে বলতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাকো, আলাপ করিয়ে দাও—আপনি আবোল-তাবোল কত রকম কিছু ভাবতেন। বেণুদি আপনাকে বলত, মিলনী তোমার বাঁশি শুনে তোমার সাথে আলাপ করতে চেয়েছিল, তাই ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। আপনি কত রকম কিছু ভাবতেন।

কী ভাবতাম ?

যান ! আপনি যেন ছেলেমানুষ !

প্রায় বুড়ো হয়ে পড়েছি। এই ফাল্গুনে তিরিশ বছর বয়স হল।

তিরিশ !

বাঁশি বাজাই বলেই আমাকে কলেজের ছাত্র ভেবেছিলেন নাকি ?

বাঁশি বাজান বলে ভাবিনি। আমাকে আপনি আপনি বলছেন বলে ভাবছি ভাবব নাকি।

তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে কখনও মিশিনি, মন-মেজাজ জানি না। রেণু আমার কাছে সাইকলজি পড়ে, তুমি রেণুর কাছে কলেজের পড়া পড়—কিন্তু আমি হঠাৎ তুমি বললে তুমি খুশি হবে না রাগ করবে সত্যি আমার জানা নেই !

সাইকলজি পড়ান ? আবার বাঁশিও বাজান ?

কী করি বলো ? দুটোই দরকার হয়েছে !

দারোয়ান একরাশি ফুল নিয়ে এসে হাজির হয়। তার গামছায় বেঁধে।

ফুল দেখে সুনীল বলে, এ তো সব সিজন ফ্লাওয়ার—বিলেতি ফুল। এ ফুলে তো পিসির পুজো চলবে না।

মিলনী ভীষণ চটে যায়।

শুয়ারকা বাচ্চা, তুম ইয়ার্কি শুরু কর দিয়া ? কোন ফুলমে পূজা হোতা তুম নাহি জান্তা হায় ?

রামশরণ সবিনয়ে জানায় যে তাকে পূজার ফুল তুলে আনার হুকুম দেওয়া হয়নি। সে কী করে জানবে !

মিলনী আবার বলে, শুয়ারকা বাচ্চা !

হঠাৎ সে হাসে।

আসুন আমার সঙ্গে। নিজের হাতে পুজোর ফুল তুলে নিন।

রামশরণ দুবার শুয়ারকা বাচ্চা শুনেও কনৌজী ব্রাহ্মণের উদারতার সঙ্গে বলে, সার বাগানমে আয়া।

অবিনাশ সকলের কাছে অবিনাশবাবু, কিন্তু রামশরণের কাছে সে সার।

অবিনাশের সঙ্গেও মুখচেনা ছিল সুনীলের।

মিলনী পরিচয় করিয়ে দিতে অবিনাশ বলে, তুমি পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিলে না?

হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা আদায়ও করেছিলাম।

অবিনাশ হাসে।

চাঁদা চাইবার কায়দায় তোমার অরিজিন্যালিটি ছিল। সবাই এসে বলে, আমার অনেক টাকা আছে কাজেই আমাকে বেশি চাঁদা দিতে হবে। তুমি কেবল ও কথা বলনি। কী করে বেশি চাঁদা তোলা যায় পরামর্শ চেয়েছিলে। তারপর কৌশলটাও জানিয়েছিলে নিজেই। প্রথমেই আমার নামে যদি মোটা টাকা ধরা থাকে— অন্যেরা কম দিতে পারবে না, যে এক টাকা দিত সে দু টাকা দেবে। এ রকম কায়দা করে চেয়েছিলে বলেই পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলাম—নইলে কুড়ি টাকার বেশি দিতাম না।

অবিনাশ খুব রোগা। দেখে মনে হয় মানুষটা বুঝি খেতে না পেয়ে পুষ্টির অভাবে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে। বয়সে প্রৌঢ় মনে হয়—বয়স যে তার সত্তরের দিকে ঘেঁষেছে এটা অনুমান করা যায় না।

মিলনী বলে, ইনি খুব ভালো বাঁশি বাজাতে পারেন।

অবিনাশ বলে, তা জানি।

তুমি কী করে জানলে?

ওর বাঁশি শুনেছি। গত পুজোর জলসাতে ও তখন বাঁশি বাজিয়েছিল।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনার সে কথা মনে আছে? মিলনী বলে বাবার অদ্ভুত মেমারি। সামান্য একটা বিষয় আমরা হয়তো দুদিনে ভুলে যাই, পাঁচ বছর পরে বাবার মনে থাকে।

অবিনাশ বলে, তুমি ভুল বললে—সামান্য বিষয় মনে থাকে না। মনে রাখার মতো কোনো একটা বৈশিষ্ট্য থাকলে তবেই মনে থাকে। তোমার বাঁশির সুরটা আমার ভালো লেগেছিল—কাদুনে সুর বাজাওনি।

তাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে অবিনাশ পূজার জন্য ফুল তুলে বিদায় নেয়।

পরের শনিবার সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে কয়েকজনকে বাঁশি শোনাবার নিমন্ত্রণ করে মিলনী বলে, আসবেন তো?

আসব।

তার এই বাড়তি বিনয়টুকু ভালো লাগে সুনীলের।

২

সন্ধ্যার পর মনোজ আসে খবর নিতে।

সুনীল তখন বাড়ি ছিল না।

লতাকে মনোজ জিজ্ঞাসা করে, সুনীল আজ ভোরে বেড়াতে যায়নি?

গিয়েছিল তো ?

কী ব্যাপার হল ? আমায় ডাকল না কেন ?

ততক্ষণ চা পান চলুক, দাদা এলে সমস্যার মীমাংসা হবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই সুনীল ফিরে আসে। তার কাছে ব্যাপার শুনে মনোজ বলে, মাথার চিকিৎসা কর। জ্যোস্না দেখে রাত তিনটের সময় বেড়াতে বেরিয়ে গেলে ?

বাণী শুনে বলে, কী সর্বনাশ ! রাত তিনটে থেকে বাইরের দরজা খোলা পড়েছিল ! সমস্ত যদি চুরি হয়ে যেত ! মনোজ বলে, সত্যি এবার ওর চিকিৎসা দরকার। জোর জবরদস্তি করে একটা বিয়ে না দিলে আর চলছে না।

সুনীল বলে, নিজের মাথার চিকিৎসা তো করলে দু দুবার—লাভ হয়েছে কী ?

লতা আপশোশের আওয়াজ করে বলে, কীভাবে যে তুমি কথা কও দাদা !

মনোজের দুনম্বর বউ মারা গিয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে—কাজেই বউয়ের কথা তুলে মনোজকে খোঁচা দিতে শুনে লতার প্রাণে আঘাত লাগে।

মনোজ নির্বিকারভাবেই বলে, মাথা ঠিক থাকলে তো ঠিকভাবে কথা কইতে পারবে !

মনোজের এই ভাবটা লতা বা বাণীর পছন্দ হয় না। দুবার বউ মরল মনোজের কিন্তু একবারও তাকে শোকে বেশি রকম বিচলিত হতে দেখা গেল না, বৈরাগ্যের চিহ্নও পাওয়া গেল না তার কথায় বা চালচলনে।

বউয়ের মরণ সহজে সামলে নেওয়াটা মেয়েদের পছন্দ করা সম্ভব নয়।

লতা ও বাণীর সামনে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও খানিক পরে বাইরের ঘরে বসে দুই বন্ধুতে যখন একান্তে আলোচনা হয় তখন বেশ চিন্তিতভাবেই প্রসঙ্গটা সুনীল আবার টেনে আনে। বলে, তামাশা নয় আমার সত্যি কিছু হয়েছে।

মনোজ শান্তভাবেই বলে, আশ্চর্য নয়। কিছু না হলে এ রকম ধারণা আসে না, এভাবে কেউ বলে না—আমার কিছু হয়েছে। ব্যাপার কী ?

খুঁটিনাটি অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ছি। কেমন যন্ত্রের মতো হয়ে উঠছে জীবনটা। একটু এদিক-ওদিক হলে মনটা খুঁতখুঁত করে—বিধবাদের যেমন ছুঁচিবাই হয়, সেই রকম। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে, মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত কষ্ট হয়। সব ফাঁকা লাগে। মনটা উদাস হয়ে যায়—

সুনীল নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তুলবার চেষ্টা করে বন্ধুর কাছে, কিন্তু নিজেই টের পায় যে বক্তব্য তার ধারাই থেকে যাচ্ছে।

মনোজ শেষে বলে, অনেক কথাই তো বলবি, সোজা কথার স্পষ্ট জবাব দে দেখি। মনটা উড়ুউড়ু করে না বিষণ্ণ লাগে ?

সুনীল বলে, কী রকম যে লাগে—

বলতে পারছিস না। কথা দিয়ে বোঝানো যায় না, কেমন ?

ঠিক এ রকম ভাব তো হয় না। বৈরাগ্য হয়েছে বলতে পারতাম কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়। ভয়ানক ফাঁকা ফাকা লাগছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, অথচ এদিকে বেঁচে থাকতে যে ভালো লাগছে না তাও নয়। পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই সঙ্গে খিদে না থাকলে মানে বোঝা যায়। বেশ চনচনে খিদে, খেয়ে দিব্যি আরাম লাগছে অথচ পেটে যেন কী রকম একটা কষ্ট।

মনোজ হেসে বলে, তোর উপমা আমার মাথায় ঢুকল না ভাই। খিদে পেলে জোর করে না খেয়ে থাকলেও কিন্তু পেটের মধ্যে কষ্ট হয়।

তার মানে মনের খিদে চেপে রাখছি ?

অসম্ভব কী ?

সুনীল মাথা নেড়ে বলে, না।

কোনো মেয়েকে— ?

সুনীল মাথা নাড়ে।

মনোজ বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুই প্রেমে পড়লি অথচ আমি জানলাম না— এ খাপছাড়া ব্যাপার কী করে হয় ! একটা বিয়ে করে দ্যাখ না কী হয় ? হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুনীল মাথা নাড়ে।

সুনীলের বিয়ে না করার কারণ মনোজের জানা।

একশো তিরিশ টাকা বেতন স্থায়ী চাকরি।

কিন্তু বিয়ের কথা বললেই সুনীল কানে আঙুল দেয়।

বলে, তোমরা খেপেছ ? অন্তত দুশো টাকার কমে আজকাল দুটো মানুষের চলে !

লতা বলে, পাড়ার ক টা লোকে দুশো টাকা মাইনে পায় ? তোমার মতো মাইনেওলা গন্ডাগন্ডা লোক যে বিয়ে করেছে, তাদের চলছে কী করে ?

চলছে ? কে বলল চলছে ? ওকে চলা বলে ? তাহলে তো গাছতলায় থাকাকেও চলছে বলতে হয় !

মুখে জোরের সঙ্গে এ কথা বললেও মনে মনে সুনীল কিন্তু সুনিশ্চিত নয় যে এটাই তার বিয়ে না করার আসল কারণ—বিয়ে করার পক্ষে তার বেতন যথেষ্ট নয়।

বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলে নয় বলা যেত যে বেতন কম বলে সে বিয়ে করছে না, হিসাব কষে অগত্যা মনের সাধটা চেপে রাখছে। বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা দূরে থাক, কথাটা ভাবলেও তার গভীর বিতৃষ্ণা জাগে।

বিয়ের নামেই যখন এত বিতৃষ্ণা জাগে - কী করে বলা যায় যে আসল কারণ এই বিতৃষ্ণা নয় ? সাধ জাগলে এই মাইনেতেই সে যে চোখ কান বুজে বিয়ে করে বসত না, ভবিষ্যতে করে বসবে না, তার স্থিরতা কী !

বিয়ে সম্পর্কে সুনীলের বিরাগের খবর মনোজ জানে। কেন এই বিরাগ এটাই কেবল সে বুঝতে পারে না।

এই দিক দিয়ে আজ সে কথা তোলে। বলে, একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না ভাই। বিয়ে করে সংসারী হবার অনিচ্ছা মানুষের থাকে কিন্তু এ সব মানুষ সংসারের বদলে অন্য কোনোদিকে ঝোঁকে। একটা কোনো বিশেষ কাজ নিয়ে মেতে থাকে ধর্মটর্ম হোক, দেশের কাজ হোক কিংবা জ্ঞানচর্চা হোক, একটা কিছু থাকে। নয়তো কোনো ব্যায়াম ট্যায়াম থাকে, পাগলামি থাকে। মানে আর কী, বিয়ে করে সংসারী হওয়াটাই সংসারের সাধারণ নিয়ম, বেশির ভাগ মানুষ এটা করে। যে করে না সে একটু অসাধারণ হয়, একটু খাপছাড়া হয়। কিন্তু তোর বেলা তো এ সব কোনো কারণ খুঁজে মেলে না। তোর কোনোদিকে ঝোঁক নেই, কিছুই তুই করিস না। ধর্মকর্মে তোর মন নেই, টাকা চাস না, বিদ্যা চাস না, দেশের কোনো কাজ করিস না—কোনো নেশাও তোর নেই। তোর কেন বিয়ে করতে অনিচ্ছা হবে ?

সুনীলকে খুশি হতে দেখে মনোজ একটু ভড়কে যায় প্রথমে। সুনীলের কথা শুনে সে তার খুশি হবার কারণটা টের পায়।

সুনীল বলে, ঠিক, ঠিক। আমিও ঠিক এই কথাটা ভাবছিলাম। জানিস, এই খটকাটাই আমার মনে বড়ো হয়ে উঠেছে আজকাল। আমি খাপছাড়া মানুষ যদি হই—অন্য সব খাপছাড়া মানুষের মতো নই কেন ? সব দিক দিয়ে সাধারণ—অথচ এ রকম অসাধারণ মতিগতি কেন ? ভাবতে ভাবতে মাথাগরম হয়ে যায় ভাই !

মনোজ ইতস্তত করে বলে, আমার কী মনে হয় জানিস ? তুই বড়ো বেশি ভাবিস। বউ নেই কাজ নেই, নেশা নেই—ভাবনা রোগ ধরেছে তোকে। এমনি নেশা নেই ভাবনাটাকে তুই নেশায় দাঁড় করিয়েছিস।

সুনীল চুপ করে থাকে। হঠাৎ কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারছে না বুঝতে পারে। একটু ভেবে দেখা দরকার।

মনোজ বলে, ঠিক যে দুশ্চিন্তা তা নয় - শুধু চিন্তা। সংসার থাকলে সংসারের চিন্তায় মানুষ যেমন ডুবে থাকে, নিজের আবোল তাবোল চিন্তা নিয়ে তুই তেমনি মেতে আছিস।

তাই মনে হয় আমার।

জ্ঞানীরা না ঘুমিয়ে চিন্তা করছে– তাদের চিন্তার একটা ধারা আছে, নিয়ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। তোর ও সব বালাই নেই। নিজের মনে শুধু নিজের কথা চিন্তা করিস।

পাগল হয়ে যাব না তো ?

না, না। চিন্তা করে কেউ পাগল হয় ? বড়ো বড়ো লোকেরা সবাই তাহলে পাগল হয়ে যেতেন। একটা কাজ কর না ?

কী কাজ ?

বলে, পড়াশোনা কর।

পড়াশোনা ?

ডিগ্রি আছে জানি। আরও ডিগ্রির পড়াশোনা নয়। কোনো একটা বিষয়ে ভালো করে জানবার জন্য পড়াশোনা। এলোমেলো ভাবছিলি, একটা বিষয়ে নিয়মমাফিক ভাববি। আমার মনে হয়, তোর মগজটা একটু বেশি রকম চোস্ত। ঠিকমতো চালাবার কেউ ছিল না, থাকলে পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে পাস করতো, বড়ো একটা বিদ্বান হয়ে দাড়াতিস।

বই পড়ে কিছু হয় ?

হয় না ? বই ছাড়া মানুষ সভ্য হতে পারত ? আগে বই না এলে বেলগাড়ি মোটরগাড়ি জাহাজ এরোপ্লেন অ্যাটম বোমা হতে পারত ?

আসল কথাটা বুঝতে পেরেছি। আসলে জ্ঞানচর্চা নিয়ে মাততে বলছিস তো ? জ্ঞানচর্চা আরম্ভ করতে পারি জোরসে কিন্তু মাততে পারব কি ? কোনো বিষয়ে রস না পেলে গায়ের জোরে মাতা যায় ?

মনোজ বলে, কী জানিস, নেশাও অনেক সময় মানুষের তেরি হয়ে যায়। প্রথমে হয়তো নীরস লাগে, তারপর ঘাটতে ঘাঁটতে মশগুল হওয়া যায়। কোনো একটা বিষয় ধরে একবার লেগেই দ্যাখ না। পড়তে আরম্ভ করে হয়তো আরও বেশি জানবার বোখ চেপে যাবে, সব ভুলে পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে মেতে থাকবি।

দেখি ভেবে।

৩

ভেবে দেখতেই দিন কেটে যায়।

কিছু আর করা হয় না।

যা ভালো লাগে না মানুষ তা কী করে গায়ের জোরে অবলম্বন করবে ?

আপিসে যেতে ভালো লাগে না তবু আপিসে যায় বটে নিয়মমতো, কিন্তু সে হল আলাদা কথা। একটা কিছু ভালো লাগে না বলে তো আর উপোস করে মরা যাবে না।

বাজে ডাল-তরকারি দিয়ে কাকবওলা ভাত গিলতেও ভালো লাগে না কিন্তু তাই বলে একবেলা ভাত না খেয়েও তো রেহাই নেই। রুটি চিবোতে চিবোতে মনে হয় ভেতো বাঙালি হয়ে না জন্মালেই বোধ হয় ভালো ছিল কিন্তু রুটিও সমানে চিবিয়ে যেতে হয় একবেলা।

বই পড়তে গেলে মনটা কেবল ব্যাকুল হয়। গল্প-উপন্যাস পড়তে বসলে তাব মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগে, তার মধ্যে প্রধান প্রশ্নটা এই যে মানুষেব জীবনে এত সংঘাত কেন—কী এব প্রয়োজন ছিল। কেন মানুষ নিজেদের জীবনকে এভাবে জটিল কবে, অশান্তিতে ভবে দেয়।

জ্ঞানের বই পড়তে বসলে তাব মনে হয় মানুষেব কত জানবাব আছে, কতটুকু জ্ঞান মানুষ সঞ্চয় করেছে—কিন্তু সে এই জ্ঞান দিয়ে করবে কী ? জানার তো শেষ নেই—খানিকটা জেনে তাব কী আর লাভ হবে ?

যা কোনো কাজে লাগে না সে জ্ঞান তাসপাশার নিয়ম জানার চেয়ে মূল্যহীন। তাসপাশার নিয়মের জ্ঞানটা তবু খেলাব কাজে লাগে !

রেণু বলে, আপনার এ সব খাপছাড়া কথা শুনলে হাসি পায়। জ্ঞানকে অমূল্য বলা হয়, আপনি কথাটার উলটো মানে করেছেন। জ্ঞান না হলে মানুষ কখনও মানুষ হতে পারত ? মানুষ যে ক্রমেই সভ্যতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আবিষ্কাবেব পর আবিষ্কার করে চলেছে, সে তো মানুষ জ্ঞানেব চর্চা করে বলেই !

সুনীল হেসে বলে, তা বলিনি—জ্ঞানকে তুচ্ছ করিনি। আমি বলছি আমাব কথা। আমার যা কোনো কাজে লাগবে না আমি তা শিখে কী করব ? নিজের মনে আউড়ে যাওয়া ছাড়া সে জ্ঞানেব কোনো মূল্যই থাকবে না।

লেখাপড়া শিখলেন কেন তবে ?

চাকরি করাব জন্য !

আপনি তাহলে বলতে চান যাবা চাকরি কববে না তাদেব লেখাপডা শেখার দরকাব নেই ? চাষি মজুর এরা মূর্খ হযেই থাকবে ? দেশে শিক্ষা বাডাবার দরকাব নেই ?

সুনীল একটা সিগারেট ধরায়।

আপনি সোজা কথাটা এমনভাবে বাড়িয়ে ঘুবিযে আমায চেপে ধবেন তর্কেব সময ! অন্যের কথা আমি বলিনি—আমি শুধু বলছি আমার কথা।

আপনি কি পৃথিবী-ছাড়া মানুষ ?

তা কেন হবে ? আমার মতো অনেকে আছে। আমার যা জীবন তাতে জ্ঞান আরও বাড়ালে কোনো কাজেই লাগবে না ! চাষিমজুর অশিক্ষিত লোকের শিক্ষা নিশ্চয় দবকাব—নিজেদের অবস্থা বোঝার জন্য দাবিদাওয়া বোঝার জন্যে, অবস্থা ভালো করার উপায় জানাব জন্যে। সে জন্য তাদের যতটা আর যে রকম শিক্ষা দবকার তাই হবে তাদের পক্ষে যথেষ্ট। ছাঁকা জ্ঞানচর্চার জন্য তারা কেন সময আর এনার্জি নষ্ট করবে ?

ওদের মানসিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন বুঝি দরকার নেই ?

নাঃ, আপনি কিছুতেই আমার কথাটা বুঝবেন না ! আমিও তো তাই বলছি ! স্কুলে বাংলা পড়ান, দরকার শব্দটার মানে বোঝেন না ! যার যতটা জ্ঞান দরকার তার সেটা অর্জন করা দরকার বইকী, দরকারটা মানসিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন আর্থিক জীবন সব কিছু ধরেই।

এবার রেণু হেসে ফেলে।

বলে, আপনি সুন্দর বাঁশি বাজান কিন্তু কথা বলেন বিশ্রী ! মনের ভাব একেবারে ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন না ! বললেই হত ফাঁকা অকেজো বুদ্ধিচর্চার কোনো দাম নেই !

সুনীল আহত হয়ে বলে, তাই বললাম না আমি ?

কখন বললেন ? আপনি বললেন জ্ঞানের কথা ! জ্ঞান মানেই মানুষের যা জানা উচিত, প্রত্যক্ষভাবে কাজে না লাগলেও যা কাজে লাগে ! আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো আপশোশ কী জানেন ? পড়াশোনার অবসর পেলাম না। শুধু পড়িয়েই জীবন কাটল—যন্ত্রের মতো বাঁধা বুলি বাঁধা গত পড়িয়ে। মেয়েদের কচিমুখের দিকে চেয়ে জীবনে ঘেন্না ধরে যায় !

রেণু বেশ আয়েস করে বসেছে চেয়ারে।

রেণু ছিল বাপের বড়োই আদুরে ছোটো মেয়ে। তিনটি মেয়েকে যেভাবে হোক পার করে দেবার পর এই মেয়েটিকে কলেজে পড়াতে পেরে সে যেন ক্লিষ্ট ক্লান্ত শান্তিহীন জীবনে প্রথম কর্তব্য পালন করার আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল। নিজেও অমানুষ, ছেলেমেয়েগুলিকেও অমানুষ তৈরি করেছে—জীবন তো ছিল অভিশাপ। তবু একটা মেয়েকে মানুষ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছে ভেবেই তার কী আনন্দ !

ছেলেরা চাকরি পায় বিয়ে করে আর ভিন্ন হয়ে যায় !

মেয়েদের দান করতে হয় অর্থাৎ বিদেয় করতে হয় ঘুষ দিয়ে। ছেলেরা নিজেরাই বিদেয় হয়ে যায় বাপকে মাইনের টাকা দিতে হবে বলে।

বেচারিদের দোষ নেই।

জীবন গেছে পালটে আর হয়েছে বিষম কঠিন, আজকের দিনে যা অবস্থা তাতে একসাথে থাকার মানেই আপনজনের সাথে নিষ্ঠুর সংঘাতের অশান্তি মেনে নেওয়া।

টুইশনি করে আর স্কুলে পড়িয়ে নিজেই করে নিয়েছিল বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা।

জোর করে বলেছিল, এবার তো নিশ্চিন্ত হলে ?

রেণুর মা বেঁচে থাকলে অবশ্য ভাবনার কারণ ঘটত। মেয়ে বিয়ে করবে না, নিজে রোজগার করে খাবে, এ ব্যবস্থা মানাতে তার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হত সন্দেহ নেই।

নীলাম্বরের মনটাও খুঁতখুঁত করছিল—কিন্তু মেয়েই ছিল তার জীবনে একমাত্র অবলম্বন। মেয়েকে ছেড়ে সে থাকতে পারত না। বিয়ে হলে মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে—তার চেয়ে রোজগার যখন করছে দু-একবছর পরেই না হয় বিয়ে হবে !

নীলাম্বর মারা যাবার পর বিধবা দিদি তার তিনটি ছেলেমেয়ে আর ছোটো ভাইটিকে মানুষ করার দায়িত্ব চেপেছে তারই ঘাড়ে। বড়োভাই দুজন সামান্য সাহায্য করে।

রেণু ভার না নিলে যে সুরবালা আর প্রদীপের সব দায়িত্বই তাদের নিতে হত বাধ্য হয়ে এটা খেয়াল থাকলেও হাত তাদের কিছুতেই যেন আরেকটু দরাজ হতে চায় না !

রেণুরও খাটুনি কমাবার সুযোগ হয় না।

খাটুনি বইকী !

সকালে পড়াতে হয় মিলনীকে, দুপুরে যেতে হয় স্কুলে পড়াতে। সন্ধ্যার পর পড়াতে যেতে হয় পাড়ার আরেকটি মেয়েকে।

নিজেও একটু পড়াশোনা করে।

সমিতির কাজও দু-একটা তার উপরে চাপে।

রাত্রে নিজের পড়াশোনা করতে গিয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

তখন সুনীলের বাঁশির সুর কানে এলে তার দেহমনে কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটে। প্রথমে যেন ঝিমিয়ে অবশ হয়ে আসে শরীরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য, একটা অকথ্য পীড়াদায়ক হতাশার ভাব জাগে—সব যেন শেষ হয়ে গেছে জীবনে, অর্থহীন শূন্যতা ছাড়া ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই।

অল্পক্ষণের জন্য একটা ঘোরের মতো এ ভাবটা জাগে।

তারপর ঘুমের ঘোরের মতোই এটা কেটে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি চাঙা হয়ে ওঠে।

একেবারে যেমন ঝিমিয়ে গিয়েছিল ঠিক তাব উলটোটা ঘটে এখন। সারাদিনের পরিশ্রমের শ্রান্তিক্লান্তি আর ঘুমের আবেশ সব যেন উপেই যায় না শুধু—নতুন প্রাণের জোয়ার এসে যেন তাকে বেশি রকম প্রাণবন্ত করে তোলে।

জীবনটা মনে হয সুন্দর। আনন্দ উৎসাহ যেন ধরবে না প্রাণে !

বাঁচার জন্য লড়াই করছে, নিজের জীবন আর অন্যের জীবন আরেকটু সুন্দর কবার জন্য লড়াই করছে—মানুষ হয়ে জন্মানোর চেয়ে বড়ো সার্থকতা কি খুঁজবে জীবনে ?

অনেক বাত পর্যন্ত ঘুম আসে না কিন্তু কোনো কষ্টই হয় না সে জন্য। পবদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেহমনেও কিছুমাত্র গ্লানি বা অস্বস্তি বোধ করে না।

জগতে সব ঠিক নেই। জীবনে অনেক অভাব, অনেক অপূর্ণতা, অনেক দুঃখ।

কিন্তু সব ঠিক করাব লডাই তো আছে ! একদিন সব ঠিক করে নেওযা যাবে—একা তার জন্য নয়, সব মানুষের জন্য—এ বিশ্বাস তো আছে !

এ বিশ্বাস যেন একটু নরম হয়ে গিয়েছিল, জোরালো হয়ে ঠিক যেন সঞ্জীবনী সুধার মতোই দেহমনকে তার আবার চাঙা করে তুলেছে !

পরদিন সুনীলকে সে বলে, কাল রাত্রে চমৎকার বাজিযেছিলেন। আপনার বাঁশি শুনে বেশ তাজা লাগে নিজেকে !

সে কী! শান্তি ঠিক উলটো কথা বলে। বাঁশি শুনতে ভালোই লাগে কিন্তু ওব নাকি মনটা কেমন কেমন করে, কান্না পায !

আমার কিন্তু আনন্দ হয !

সুনীল বলে, এ তো ভারী সমস্যার কথা হল !

কেন ?

একই লোকের বাঁশি শুনে একজনের আনন্দ হয, একজনের কান্না পায় !

এতে সমস্যার কী আছে ? যে যেমন ভাবের ভাবুক তার তেমনি প্রতিক্রিয়া হয় ! মন কেমন করার ন্যাকামি আমার আসে না।

আপনার ভারী শক্ত মন।

আপনার চেয়ে ?

আমার মন নবম। নিজের বাঁশির সুরে নিজেই ব্যাকুল হই।

রেণু বলে, ওটা নরম মনের লক্ষণ নয়—সুর সৃষ্টির আবেগ। প্রাণ দিয়ে না বাজালে কি কেউ ভালো বাঁশি বাজাতে পারে ? বাঁশি কেন, গান গাইতে সেতার এস্রাজ বাজাতে ও রকম ভাব আসা চাই। নইলে জমে না।

দেখা হয়েছিল প্রতিদিনেব মতোই। সুনীল বেড়িয়ে ফিরছিল, রেণু যাচ্ছিল মিলনীকে পড়াতে।

রেণু সুরসৃষ্টির আবেগ উন্মাদনার কথা ব্যাখ্যা করে চলে যায়, সুনীল কিন্তু এত সহজে চুকিয়ে দিতে পারে না কথাটা।

রেণু অনেকবার তার বাঁশির প্রশংসা করেছে, কিন্তু এভাবে কখনও করেনি ! তার বাঁশি শুনতে ভালো লাগা এক জিনিস, আর বাঁশি শুনে তাজা বোধ করা আরেক জিনিস !

রঞ্জন দাঁড়িয়েছিল তাদের বাড়ির সামনের দাওয়ায়, মুখখান তার সকালবেলাই করুণ দেখাচ্ছে। রঞ্জন কলেজে পড়ে—ছেলে ভালোই, তবে একটু লাজুক আর ভাবুক।

কাল আমাব বাঁশি শুনেছিলে বঞ্জন ? না ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

শুনেছি,

কেমন লাগল ?

সুন্দব বাজান আপনি। সবাই প্রশংসা কবে।

উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা কবে ফেলে নিজেব উচ্ছ্বাসেব জন্য বঞ্জন একটু লজ্জা বোধ কবে।

সুনীল প্রশ্ন কবে, ভালো লাগে বুঝলাম। কী বকম ভালো লাগে ?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেবে বঞ্জন তাকিযে থাকে।

আমি বলছি কী, কাল যখন বাঁশি শুনছিলে, তোমাব কী বকম লাগছিল ? বেশ মজা লাগছিল, নিজেকে তাজা বোধ কবছিলে, না উদাস লাগছিল ?

উদাস লাগছিল।

মনটা কেমন কবছিল ?

হ্যাঁ।

পাশেই শান্তিদেব বাড়ি।

শান্তি সবে ঘুম থেকে উঠে কলতলায মুখ ধুতে যাচ্ছিল। আলগা আচলটা ঠিক কবে শান্তি বলে, সুনীলদা এই সকালবেলা হঠাৎ যে ?

এমনি এলাম। বাঁশি শুনেছিলে ?

কানেব পাশে বাজান, না শুনে উপায কী ?

ঘুমোলেই হয !

আপনাব বাঁশি শুনতে শুনতে ?

তুমি বাড়িযে বলছ !

শান্তি একটু হাসে

কেন বিনয কবছেন ? নিজে তো জানেন ভালো বাজাতে পাবেন আব নেহাত বাজে বেবসিক মানুষ ছাড়া আশেপাশেব সবাই আপনাব বাঁশি শোনে।

শান্তিব মুখেব ভাব পবিবর্তনেব দিকে ভালো কবে নজব বেখে সুনীল জিজ্ঞাসা কবে, ঠিক কবে বলবে, বাশি শুনে কালও তোমাব কান্না আসছিল ?

শান্তি চোখ বুজে একটু ভেবে নিযে বলে, ঠিক কান্না কী আসে ? বাশি শুনলে সবাব যেমন হয, প্রাণটা আকুলি-বিকুলি কবে, মনেব মধ্যে যেন -

মজা লাগে না ?

মজা মানে ? ভালো লাগে। আনন্দই হয, তবে সে যেন কেমন এক বকমেব আনন্দ। কবুণ সুব শুনলে আপনাব হয না এ বকম ? ভালো লাগছে তবু যেন কষ্ট হচ্ছে ?

বোজ এ বকম হয ?

বাঁশি শুনলে যেমন হবাব তা বোজ হবে না ? আজ এক বকম কাল আবেক বকম হবে ?

শান্তি একটু থেমে বলে, আজ এত খুঁটিযে খুঁটিযে জিজ্ঞেস কবছেন ?

সুনীল একটু হেসে বলে, জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল খাবাপ লাগে নাকি।

পবে খাবাপ লাগে। বাঁশি থামাব পব।

শোনাব সময লাগে না তো ?

না। তখন বেশ লাগে।

রান্নাঘরে সকালবেলার জলখাবারের পাট চলছিল। বাড়ির সকলে সেখানে ছিল। এ বাড়ি থেকে তিনজন ন-টায় আপিসে পাড়ি দেয়, সকালবেলার সামান্য খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেওয়া হয়।

তার বাঁশি শোনার ফলে খাবার লাগায় এবং ঘুম না আসায় শান্তিই বোধ হয় এত দেরিতে উঠেছে।

শান্তির দাদা ভবানী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, এই যে সুনীল। চা খাবে নাকি ?

চা তো পেলেই খাই।

ভবানীর স্ত্রী মিনতি চা দিতে এসে বলে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত বাজিয়েছিলেন।

তার মানে অনেক রাত পর্যন্ত জ্বালিয়েছিলাম তো ?

না, না। আপনি সুন্দর বাজান। রেডিয়োতে রাত বাড়লেই কী সব মার্কিনি সুর দেয়, কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তারপর আপনার বাঁশি খুব ভালো লাগে।

রেডিয়োর কল্যাণেই একটু বেশি রাতে বাজাতে শুরু করতে হয়।

ভবানী বলে, আমি আগে ভাবতাম ফাজিল-ফক্কর ছোড়াই শুধু বাঁশি বাজায়। এখন দেখছি বাঁশিটা বাজনা হিসাবেও বাজে নয়, ফাজিল ছোঁড়া না হলেও বাঁশি বাজানো যায়।

সুনীল হেসে বলে, আমাদের কেষ্টঠাকুরের জন্য বাঁশি আর বাজিয়ে সম্পর্কে এ রকম ধারণা। তার বাঁশি শুধু বাধা বাধা বলত, লোকে ভাবে বাঁশিটা বুঝি বিশেষ করে মেয়েদের মন ভুলাতে চেয়ে ফাজিল ছোঁড়ারাই বাজায়।

ভবানী প্রশ্ন করে, আচ্ছা শুধু রাত্রে বাজাও কেন ?

সুনীল বলে, বাঁশিটা দূর থেকে শোনার বাজনা। চারিদিক একটু স্তব্ধ হলে বাজাতে হয়।

ভবানী বলে, এও কিন্তু বাঁশি নিয়ে মানুষের খুঁতখুঁতানির একটা কারণ। দূর থেকে সুর ভেসে আসছে, যে বাজাচ্ছে তাকে দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকে নিঝুম হয়ে আছে—

ভবানী একটু হাসে, যাই বলো, বাঁশিটা কাব্যিক বাজনা।

৪

সুনীল খুব চাপা।

কতখানি চাপা সে নিজেও জানে না, অন্যেরাও টের পায় না।

তার মনে নানা ভাবের যে সব কথা জাগে, আবেগ অনুভূতির জোয়ারে যে সব তরঙ্গ ওঠে, এমন সহজ আর স্বাভাবিকভাবে বাইরে বিশেষ কোনো প্রতিফলন না ফেলে তার বেশিরভাগ তার ভিতরেই লীন হয়ে যায় যে খুব ঘনিষ্ঠ মানুষও তার ভিতরের খাঁটি পরিচয় খুব কমই টের পায়।

তার ভাবুকতা আর আবেগ ব্যাকুলতা একেবারেই গোপন থাকে। হৃদয়ের দিক দিয়ে তাকে বরং বেশ খানিকটা আবেগবিহীন শক্ত মানুষ বলেই মনে হয় লোকের।

সাধারণভাবে তার ব্যবহার আন্তরিক, আত্মীয়বন্ধুর জন্য টান আছে টের পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয় যে কখনও তার গভীরভাবে আলোড়িত হয়, বাঁশি বাজাবার সময় এবং তারপরে যে কী অবর্ণনীয় ভাবাবেশে গভীরভাবে ডুবে যায়, চাঁদ বা তারা ভরা আকাশ যে জীবনের রহস্য, জগতের সীমাহীনতা ইত্যাদি প্রশ্ন জাগিয়ে কীভাবে তার চেতনাকে নাড়া দেয়, কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না।

বেণুর পক্ষে পর্যন্ত নয়।

সুনীল নিজের মুখে যখন তাকে বলে যে তার মনটা নরম, বাঁশি বাজাবার সময় সে বড়োই ব্যাকুলতা অনুভব করে বেণু তাই অনায়াসে সে কথা অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতে পারে।

সুনীলের মতো মানুষের হৃদয়ে আবার ওই ধরনের ভাবের তরঙ্গ।

শুকনো হৃদয়ে তরঙ্গ ওঠে কখনও ? তরঙ্গ যা কিছু উঠবার তার বাঁশিতে ওঠে।

অন্যপক্ষে, বেণুকেও সুনীলের বড়োই শক্ত আর নির্বিকার মনে হয়। সে সহজে বিচলিত হয় না বলে নয়, অনেক রকম দায়িত্ব কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে বলে নয়, কথায় ব্যবহারে কখনও ব্যাকুলতা বিহ্বলতার লেশটুকু প্রকাশ পায়নি বলে।

তার মধ্যে মৃদুতা কমনীয়তার অভাব নেই, নীরস রুক্ষ রদমেজাজি সে মোটেই নয়, কিন্তু তার কোমলতা যেন কেমন এক ধরনের।

নিজের রোমেদের বা শান্তির যে কমনীয়তা সে চিনতে পারে বুঝতে পারে—বেণুর কাছে সেটা ভীরুতা, ন্যাকামি আর ঢং।

পরস্পরের জন্য তারা একটা আকর্ষণ অনুভব করে। মাঝে মাঝে আজকাল আকর্ষণটা এমন তীব্রভাবেই অনুভব করে যে দুজনেই তারা কিছুক্ষণের জন্য রীতিমতো ভাবনায় পড়ে যায়। ব্যাপারটা কী দাড়াল ?

তারপর তারা ভাবে, প্রেম, ও সব বাজে কথা।

ঘনিষ্ঠতা তাদের সাধারণ বন্ধুত্বের স্তরেই রয়ে গেছে। কারণ, প্রত্যাশা করার ভরসা করার খুঁটিনাটি সূত্র আর সংকেতগুলির আদানপ্রদান না হওয়ায় সে সম্পর্কটা তাদের মধ্যে গড়েই উঠতে পারেনি ক্রমে ক্রমে বাস্তব জীবনে কাছে এনে দেয় নারীপুরুষকে।

কাছে এনে দিতে দিতে একদিন অনায়াসে দুজনের দেহমন এক হয়ে যাবার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

সুনীল যেন অভিমান করেই তার চারিদিকে ছড়ানো গরিব দুঃখী, পঙ্গু রিক্ত মানুষগুলির দিকে তাকায় না, ওদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে চলে।

তোমরা আছ ? থাকো।

আমি আছি, আমিও থাকি।

জীবনটা কী, সুখদুঃখ কী তাই বুঝলাম না, তোমরা দুঃখী না আমি দুঃখী কী করে জানব।

কষ্ট ?

খিদের কষ্ট ? রোগের কষ্ট ? শীতের কষ্ট ? মা বাপ বউ ছেলেমেয়ে ভাইবোনের কষ্ট দেখে মায়ার কষ্ট ?

কে জানে বাবা ওটা কষ্ট কি না—হয়তো বা ওটাই বাঁচার মজা।

সময়ের শেষ নেই, আকাশের সীমা নেই, জীবনের মানে নেই, ফাঁকিতে গড়া তোমার আমার ভগবান, আনন্দ বেদনার কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল অথবা দুটোই বাজে জানা নেই।

তোমরা মেকি বা আমি মেকি কে বলবে ?

তোমাদের কাতরানিটাই হয়তো জীবনের আসল উপভোগ চরম উপভোগ। উপোস করে বা অসুখে ভুগে ছটফটিয়ে মরে যাওয়াটাই হয়তো জীবনের চরম আর সার্থক উপভোগ—সময় যে অসীম আর তার আয়ু যে দু-দণ্ডের তারই চরম প্রমাণ।

রোগে না ভুগলেও, খেতে না পেলেও তোমাকে আমাকে মরতে হবেই।

সারাদিন পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে আপিসে অসংখ্য মানুষের বাঁচার জন্য মর্মান্তিক প্রচেষ্টা দেখে এসে, একটা একটু সুস্থ মুখ দেখে নিরানব্বইটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত কেরানি, চাষি আর কুলিমজুর ফেরিওলা, দোকানি আর ভিখারি, রঙিন কাপড়ে মোড়া ক্ষুধাতুরা শিকারিনি একাকিনী বেশ্যা, ভদ্র মেয়ে, এক পায়ে কুষ্ঠের ক্ষত ব্যান্ডেজ করা যুবতি ভিখারিনি—সারাদিন জীবনের এই বিচিত্র কুৎসিত রূপ দেখে এসে, সন্ধ্যার পর চারিদিকে মার্কিনি ঢংয়ের গানবাজনায় মুখরিত অনেকগুলি রেডিয়োর বেলেল্লাপনার পরিচয় পেতে পেতে সুনীল যখন বাঁশিটি হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে বসে, তখন এই সব চিন্তা তার মনে আসে।

বাঁশি নিয়ে ছাদে যায় কিন্তু সব সপ্তাহে একদিনও বাঁশি বাজায় কি না সন্দেহ।

ছুটির দিন বাইরে বেরিয়ে মানুষের কুৎসিত জীবন না দেখলেও চলে।

ছুটির দিন সে বাঁশি বাজায়।

কাজের দিনে পথে-ঘাটে চারিদিকে যে অসংখ্য দুঃখী মানুষ দেখেছিল, তারা কি শুনবে তার বাঁশি ?

তারই মতো যারা দুঃখী মানুষের ভিড় চষে আপিসে যায় দুটো পয়সার জন্য, মানুষকে অবশ্য দুঃখী করেছে বড়ো কর্তারা, তাদের কোনো দোষ নেই, তবু নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করে যারা ম্রিয়মান হয়ে থাকে—তারাই শুধু শুনবে তার বাঁশি।

রেণু শুনবে, শান্তি শুনবে, মিলনী শুনবে—আর যে কে শুনবে মন থেকে মিলিয়ে যায় সুনীলের।

বাঁশি বাজাতে শুরু করে সে অল্পক্ষণে ভুলে যায় কেউ তার বাঁশি শুনছে কী শুনছে না।

নিজে বাজায়, নিজে শোনে, নিজেই সে মোহিত হয়ে যায়।

সিদ্ধেশ্বরের আফিমের পরিমাণটা চড়ে গেছে। কমে গেছে দুধের বরাদ্দ। সংসারে আয় আর বাড়েনি চার বছর আগে সুনীল চাকরিতে ঢোকার পর।

ব্যয় বেড়ে গেছে অনেকগুণ।

বাড়ানো হয়নি ইচ্ছা করে, বরং কমাবার অবিরাম লড়াই চালানো সত্ত্বেও বেড়ে গেছে।

আরাম বিলাস নয়, বাঁচার জন্য দরকারি কিন্তু অপরিহার্য নয় এ রকম কয়েকটা খরচ বরং কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু খরচ গেছে বেড়ে !

আয় না বেড়ে সব জিনিসের দাম চড়ে গেলে এটা ঘটবেই।

শুধু খাবার-দাবার জামাকাপড় বাড়ি ভাড়া এ সব তো নয়, শিক্ষা পর্যন্ত হয়েছে অগ্নিমূল্য।

চার বছরের ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে, বড়ো তিনজন উঠেছে উঁচুর দিকে—ধাপে ধাপে স্কুল-কলেজের বেতন আর আনুষঙ্গিক খরচ পেয়েছে বৃদ্ধি।

অমিয় আর বিনয় দুজনেই কলেজে পড়ে। অমিয় এবার গ্র্যাজুয়েট হবার পরীক্ষায় পাস করে আরও পড়তে চাইলে চারটি মেয়েরই স্কুল কলেজের পড়া চলবে কি না সন্দেহ আছে সিদ্ধেশ্বরের মনে।

দুধ কমাতে হয়েছে চাপে পড়ে। আফিম চড়ে গেছে সেই চাপেই। কারণ, শরীর খারাপ হওয়ায় আফিম না বাড়ালে মৌজ আসে না। আবার আফিম বাড়িয়ে দুধটুকু কমিয়ে দেওয়ায় শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়।

চমৎকার আত্মঘাতী চক্র।

প্রভা বলে, তুমি না আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবে ?

সিদ্ধেশ্বর বলে, পারছি কই ?

শরীর যে ভেঙে পড়ছে গো !

সেই জন্যেই তো পারছি না ! এত ঝঞ্ঝাট, চিন্তাভাবনা আর সয় না আমার।

এ আপশোশের মানে বোঝে সকলেই, সাত বছরের মীনা পর্যন্ত বোঝে !

সুনীল তাকায় না সংসারের দিকে। কোনো দায় কোনো ঝঞ্ঝাট সে ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। মাসে মাসে বেতন পেলে হাতখরচের টাকাটি রেখে বাকি সমস্ত টাকা সে মা-র হাতে তুলে দেয়।

সংসারের জন্য এইটুকু ছাড়া আর কিছুই যেন তার করাব নেই।

এবং সে জন্য তাকে কিছু বলারও নেই কারও।

বিয়ে করেনি। নিজের বাজে খরচ বিলাসিতার খরচ এক বকম কিছুই নেই। মাসে মাসে মাইনের বেশিরভাগ টাকা সে চার বছর ধরে দিয়ে আসছে সংসারে।

বিয়ে করে সে যদি ভিন্ন হয়ে যেত ?

একেবারে ডুবে যেত সিদ্ধেশ্বরের সংসাব।

সুনীলের বিয়ে করাটা এই দিক দিযে বিপজ্জনক সংসারের পক্ষে। তবু আশ্চর্য এই। সে বিয়ে কবে না বলে সকলের মনেই খুব কষ্ট।

বড়ো ছেলে মানষ হয়েছে, চাকরি করছে অথচ ঘরে একটি বউ আসেনি, এ যেন একটা চরম অসম্পূর্ণতা সংসারের, একটা স্থায়ী আপশোশ প্রত্যেকের জীবনে।

এটা জানা কথাই যে বিয়ে করে সুনীল ভিন্ন সংসার না পাতলেও এ সংসাবে একজন লোক বাড়বে। আজকের দিনে এ অবস্থায় একটা মানুষ বাড়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু জানা থাকলেই মানুষের মন কি মানতে পারে সেটা ?

যে জানা থাকার কোনো সংযত যুক্তি নেই, সমর্থন নেই !

বাড়িতে বউ আসার যে আনন্দ, সংসারের যে পূর্ণতা ঘটা, তা থেকে কেন তারা বঞ্চিত থাকবে ? কেন তাদের মেনে নিতে হবে এই অনিযম ?

আজও তাই সুনীলকে বিয়ের কথা বলা হয়।

বলতে গিয়ে প্রভা মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলে।

বাজার করা সওদা আনা এ সব পাট নেই সুনীলের।

নিজের প্রয়োজনেই সে দোকানে যায়। গগনেব মনোহারি দোকানে। নস্য কিনতে।

গগন চামচে করে নস্য মেপে দিতে দিতে বলে, ক-টা টাকা বাকি রয়ে গেছে অনেক দিন।

আমার কাছে ? আমি তো বাকি নিই না কিছু।

আপনার ভাই নিয়ে গেছে।

সংসারের হিসাবে যা বাকি যায়, মাসকাবাবে মিটিয়ে দেওয়া হয় না ?

সিগারেটের দামটা বাকি থেকে গেছে ক-মাস।

সিগারেট ?

গগন সায় দিয়ে বলে, আপনাদের অ্যাকাউন্টে একসঙ্গেই সব হিসাব ছিল, এ মাসে দেখছি শুধু সিগারেটের দামটা ক-মাস বাকি থাকছে। আপনার ভাই বলল, ও মাসে দেওয়া হবে।

ও ! আচ্ছা ওটা দিয়ে দেব। কত হয়েছে ?

তেইশ টাকা দুআনা। কিছু মনে করবেন না সুনীলবাবু, ধার দিয়ে প্রায় ডুবতে বসেছি। বারো-শো টাকার মতো বাকি পড়ে গেছে। পুরানো খদ্দের, পাঁচ-সাতবছর ধরে মাল নিচ্ছেন, বরাবর পয়লা

দোসরা তারিখে হিসেব মিটিয়ে দিয়েছেন। এখন কারও কারও কাছে তিন মাস চার মাসের পাওনা বাকি, আদায় হচ্ছে না।

দিন দিন খারাপ হচ্ছে মানুষের অবস্থা।

অমিয় শুধু সিগারেট ধরেনি, ধারে সিগারেট কিনতে শিখেছে। তার মধ্যেও চালাকি খাটিয়েছে। তাকে গগন বাকি দেবে না, তাই সিগারেট কিনেছে বাড়ির হিসাবে।

পয়সায় কুলোয় না তবু অমিয়কে পর্যন্ত সিগারেট ধরতে হয়, এ রকম কৌশলে জোগাড় করতে হয় সিগারেট।

দত্তদের বাড়ির সামনের রোয়াকে এই সকালবেলা গাঁজার ছোটো কলকেটি হাতে নিয়ে কৈলাস একলাটি বসে আছে। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আজও টের পাওয়া যায় মানুষটা সুপুরুষ ছিল। ভদ্রঘরের ছেলে, ভালো চাকরি করত, গাঁজা খেতে আরম্ভ করে তার সব গিয়েছে।

কেন যে সে গাঁজা খেতে আরম্ভ করল, কেন যে নেশাটা চড়াতে চড়াতে নিজের মাথা নিজে বিগড়ে দিল, কেন যে আজ তার সকাল থেকে কলকিতে টান দেওয়া আরম্ভ করতে হয়—সে নিজেও বোধ হয় জানে না।

সুনীলও ভেবে পায় না এ রকম তিলে তিলে কেন মানুষ আত্মহত্যা করে।

সুস্থ স্বাভাবিক ছিল মানুষটা। অন্তত বাইরে থেকে কথাবার্তা চালচলনে তাই মনে হত।

কোনো একটা গোলমাল নিশ্চয় ছিল—সংঘাত বা অসঙ্গতি। অকারণে তো মানুষ নেশা করে না।

কিন্তু কী সেই সংঘাত, অসঙ্গতি ?

কিছুই ঠেকাতে পারেনি কৈলাসকে। না তার নিজের ভিতরের বাধা, না বউ ছেলেমেয়ের মমতা, না সমাজ।

যোগাযোগ হয়তো ছিল, কেউ হয়তো গাঁজা ধরিয়েছিল কৈলাসকে। কিন্তু গাঁজা না ধরলে সে অন্য নেশা ধরত।

অমিয়রও কি প্রয়োজন হয়েছে সিগারেট খাওয়ার ? কেনার ক্ষমতা না থাকলেও যেভাবে হোক জোগাড় করে নিয়ে সিগারেট খাওয়ার ?

সিগারেট অবশ্য গাঁজা নয়। নেশা বলেই গণ্য হয় না সিগারেট খাওয়া।

অমিয়র চেয়ে অনেক কম বয়সেও অনেকে বিড়ি-সিগারেট ফুঁকতে শেখে।

কিন্তু পয়সা না থাকলেও যেভাবে হোক জোগাড় করে ফুঁকতে হবে কেন ?

সুনীল জানে, প্রথমে মাঝে মধ্যে দু-একটা খেতে খেতে অভ্যাস জন্মেছে এবং দৈনিক দু-তিনটে করে বাড়ানো পর্যন্ত হাতখরচের পয়সাতেই অমিয়র নেশার খরচ কুলিয়ে গিয়েছে।

সেইখানে সীমা রাখলে তো কোনো প্রশ্ন ছিল না ! কলেজে পড়ে, সিগারেট টানার অধিকার তার জন্মেছে। কিন্তু বাপ-ভাই রাগ করবে জেনেও লুকিয়ে চালাকি করে তাদের নামে ধারে সিগারেট কেনার স্তরে তাকে পৌঁছতে হয়েছে, এটাই হল আসল বিপদ আর সমস্যা।

অন্য বড়ো নেশা সর্বনাশকে অগ্রাহ্য করার। সিগারেট অমিয়কে গুরুজনের রাগ, বাড়িতে ছোটো হওয়া, লজ্জা পাওয়া অগ্রাহ্য করিয়েছে।

তফাত শুধু ডিগ্রির।

বাড়ি ফিরে সে সিদ্ধেশ্বরকে বলে, দোকান থেকে বাকি আনা একেবারে বন্ধ করে দাও।

কেন ? প্রত্যেক মাসে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

তা হোক, ওতে খরচ বেশি হয়। দোকানে খারাপ জিনিস দিয়ে বেশি দাম নেয়।

মাসের শেষে কুলোয় না যে।

ও সমান কথা। মাসকাবারেই আবার দিতে হয় তো। এক মাস ঠেকিয়ে রাখলে আর গোড়ার দিকে হিসেব করে চললে বাকি আনার দরকার হবে না। বাড়তি টাকাটা এবার আমি দেবখন।

অমিয়কে শাসন করল না কেন ? কেন সে বাড়িতেও ব্যাপারটা গোপন রেখে এভাবে অমিয়র বাড়ির নামে ধারে সিগারেট কেনা বন্ধ করতে চাইছে ?

ভাইকে শাসন করার তিক্ততাটুকু পর্যন্ত কি সে এড়িয়ে চলতে চায় !

কেন তার এই দুর্বলতা ?

বেণুর কাছে ধার করে সে দোকানের টাকাটা দিয়ে দেয়। বলে, আমার সই করা স্লিপ ছাড়া বাকি দেবেন না।

গগন আপশোশ করে বলে, চটে গেলেন তো ? কী করি বলুন—

সুনীল একটু হাসে।

চটিনি। কী জানেন, বাকিতে জিনিস পাওয়া গেলেই খরচ বেড়ে যায়। দরকার তো অনেক কিছুর, অভাবের শেষ নেই। বাকিতে পাওয়া গেলে মনে হয়, এখন তো কেনা যাক, পরে দেখা যাবে। নগদ পয়সা বার করতে হলে প্রত্যেকটা জিনিস কিনব কি না দশবার ভাবতে হয়।

এটা ঠিক বলেছেন।

বেণুর কাছে টাকা নেবার সময় সে তাকে হঠাৎ তার টাকা ধার করার প্রয়োজনটা জানায়নি।

সন্ধ্যার পর বেণু ছাত্রীকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরলে সে তার কাছে যায়।

বেণু ভিতরে চা খাচ্ছিল।

বারান্দায় একটি সস্তা দামের সাদাসিদে লম্বাটে টেবিল, চারিদিকে সাধারণ কয়েকটি কাঠের চেয়ার।

সম্প্রতি সে এই টেবিলে কাচের ডিসে খাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। তার আগে ছিল সেই চিরন্তন ব্যবস্থা, একবোঝা কাসার বাসন, মেঝেতে বসে এটো ছড়িয়ে খাওয়া—দুবেলা বাসন মাজার, মেঝে ধোয়ার হাঙ্গামা।

অকারণে শুধু অভ্যাসের খাতিরে অমূল্য সময় নষ্ট করা।

সুরবালার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বেণু এ ব্যবস্থা চালু করেছে।

সুরবালা এখন পর্যন্ত মেঝেতে বসেই খায়—পাথরের থালা বাটিতে।

তবে বেণু নাকি আশা করছে যে বছর খানেকের মধ্যে দিদিকেও দলে ভিড়িয়ে নিতে পারবে।

কিছু খাবেন ? দিদি ডিম রাঁধে চমৎকার।

উনি তাহলে ডিম রাঁধছেন ?

বেণু হেসে বলে, হ্যাঁ। সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি, আমার জন্য ডিম রাঁধা বাকি নেই, দিদি নিজেই রেঁধে ফেলেছে। খেটেখুটে এসে আবার রাঁধব ! একটা ডিম খান।

কম পড়বে না ?

এ প্রশ্ন একেবারেই দোষের নয়, বরং অতিশয় সঙ্গত আজকের দিনে। মাথা গুনতি হিসেব করেই সব কিছু রান্না করতে হয় বেশির ভাগ বাড়িতে।

আগে কম পড়ার প্রশ্ন তুললে মানুষ চটে যেত।

আজকাল প্রশ্নটা উচিত ও ভদ্রতাসঙ্গত বলে গণ্য হয়ে গেছে।

বেণু বলে, ঘরে ডিম আছে, একটা সিদ্ধ করে ঝোলে দিলেই হবে।

গরম একটা রুটি দিয়ে ডিম খেতে খেতে সুনীল অমিয়র ব্যাপারটা রেণুকে জানায়।

এক মুহূর্ত গুম খেয়ে থেকে গভীর খেদের সঙ্গে বলে, আমার মনটা সত্যি বড়ো দুর্বল। ওকে শাসন করা উচিত ভেবেও কিছু বলতে পারলাম না।

রেণু হেসে বলে, সে কী কথা ? আপনি তো ভালোই করেছেন ! আপনি করেন ঠিক, ভাবেন অন্য রকম !

ঠিক করেছি ?

নিশ্চয় ! প্রথমবার সামনাসামনি বকুনি দেওয়া লজ্জা দেওয়ার চেয়ে এভাবেই হয়তো ফল ভালো হবে। সেন্টিমেন্টাল ছেলে তো—যখন জানবে আপনি সব টের পেয়েছেন, টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছেন, অথচ ওকে কিছুই বলেননি মনটা খুব নাড়া খাবে।

প্রশ্রয় পেয়েও যেতে পারে তো ?

না। দোকানে যে আর বাকি দিতে বারণ করে দিয়েছেন ? এ তো এক রকম বলেই দেওয়া হল যে তার কাজটা খুব অন্যায় হয়েছে, আর যাতে না করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অথচ তার মানটাও বাঁচানো হয়েছে। এর চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ আর কী নিতে পারতেন ?

কী একটা কথা বলতে গিয়ে সুনীল যেন বলতে পারে না, কয়েক মুহূর্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে থাকে। রেণু একেবারে অবাক হয়ে যায় তার এই ভাব দেখে। আত্মবিস্মৃত মানুষ হঠাৎ নিজেকে খুঁজে পেলে যে রকম করে ওঠে, বিস্ময়ে আনন্দে তেমনিভাবে যেন সচকিত হয়ে ওঠে সুনীল।

তারপর আবার যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

রেণুর মনে হয় সেও মহামূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছে। তবু আশায় আশায় প্রশ্ন করে, কী হল ? কী বলছিলেন ?

বলছিলাম কী, টানাটানি বেড়েই চলেছে দিন দিন। একটু আয় না বাড়ালে আর চলছে না।

সত্যই কি এ কথা বলতে যাচ্ছিল সুনীল ? এ কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে ওভাবে সে তাকাবে কেন !

কষ্ট হবে।

কষ্ট কি আপনি কম করছেন ?

রেণু একটু হাসে। বলে, এটা আমার লাইন। স্কুলেও পড়াই, বাড়িতেও পড়াই, তেমন গায়ে লাগে না। আপনার অভ্যাস নেই, তাই কষ্ট হবে।

অভ্যাস হতে ক-দিন লাগে ?

সুনীল চলে যাবার পর রেণু অনুভব করে সুনীলকে আজ তার একটু রহস্যময় মনে হচ্ছে ! যেমন ভেবে আসছে ঠিক সে রকম নয় মানুষটা। আরও কিছু আছে তার মধ্যে।

৫

মিলনীকে যেন আচমকাই খুব ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে সুনীলের।

ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে পথে যেদিন মিলনী আর অনাদির সঙ্গে দেখা হয় সেদিন থেকে।

মিলনী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। মানে, ইনি দয়া করে আমায় বিয়ে করবেন।

বলেন কী ! এতই দয়া পেয়েছেন আপনার কাছে যে উল্টে আপনাকেই দয়া করতে পারেন ?

তার কথা শুনে অনাদি খুব খুশি হয়েছিল। চেহারা আর বেশে এ রকম সাধারণ মানুষটার কাছে সে এমন স্মার্ট কথা প্রত্যাশা করেনি।

দুজনকে একসাথে বেড়াবার সুযোগ দিতে নমস্কার করে সে এগিয়ে যাবে, অনাদি বলে, আসুন না একসাথে গল্প করতে করতে বেড়াই।

সে বলে, আমার সঙ্গে আপনার হাঁটা হবে না।

কেন ?

আমি হাঁটতে বেরোই না। বেড়াতে বেরোই।

চলতে চলতে মিলনী বলে, আপনি ভাবলেন তামাশা করছি ? এর চার-পাঁচটা বিলাতি ডিগ্রি আছে, মস্ত পণ্ডিত লোক। দয়া করে না হলে আমার মতো মুখ্যু খোঁড়া মেয়েকে কখনও বিয়ে করতে চায় ?

সুনীল হেসে বলে, কথাটা দয়া নয়, মায়া। মায়ার আবার অনেক রূপ জানেন তো ? এ ক্ষেত্রে মায়ার অর্থ হল প্রেম।

কার পক্ষ টানছেন সুনীলদা ?

আপনার পক্ষ !

তাহলে আমায় তুমি বলবেন। বুড়ি হয়ে স্কুলে পড়তে শুরু করেছি বটে কিন্তু আমি তো স্কুলের ছাত্রী।

অনাদিকে খুশি মনে হয়, সত্যই খুশি মনে হয়। মিলনীকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে সে যেন সত্যই বর্তে গেছে। নামকরা উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ছেলে, বিদেশ থেকে অনেক বিদ্যা অর্জন করে এসেছে, মিলনীর মতো মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পাবে বলে তার এত বেশি কৃতার্থ হওয়ার ভাবটা একটু তাজ্জব করে দেয় সুনীলকে !

বেড়াতে বেড়াতে যেটুকু আলাপ পরিচয় হয় তাতেই টের পাওয়া যায় বুদ্ধি অনাদির সত্যই খুব তীক্ষ্ণ জীবনে বড়ো হবার আকাঙ্ক্ষাটা অত্যন্ত তীব্র। এবং রুচি-অরুচি পছন্দ-অপছন্দ থেকে সব বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচণ্ড রকম সজাগ !

বিরাট একটা আগেকার বিদেশি এবং এখনকার দেশি-বিদেশি মিশেল কারখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় আলাদাভাবে এসেছিল এ দেশে শিল্পবিস্তারের কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে মার্কিনি সভ্যতার বর্তমান বিকৃতির কথা।

অনাদি যেন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, আমি ওদের সভ্যতা সংস্কৃতি পছন্দ করি। আমেরিকাতেই খাঁটি ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে। টাকা করতে চাও টাকা করবে, বিদ্বান হতে চাও বিদ্বান হবে, এমনকী গ্যাংস্টার হতে চাইলে তাও হতে পারবে।

অ্যাঁ ? গ্যাংস্টার হতে পাওয়াও আপনার মতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাকি ?

নিশ্চয় ! যে যেমন লাইফ চায়, তাই যদি সে না পেল, তার বেঁচে থাকার কোনো মিনিং আছে ? আইন আছে, পুলিশ আছে, কেউ যদি আইনকে চ্যালেঞ্জ করে চোর-ডাকাত হতে চায়, সেটা তার খুশি। ধরা পড়বে, জেলে যাবে, ফাঁসি যাবে, এ রিস্ক নিয়েই সে ওটা করছে।

সুনীল হঠাৎ হেসে ফেলে।

খুন করে ফাঁসি যাওয়াটাও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ?

নিশ্চয়, খুন তো জগতে হচ্ছেই হরদম। যুদ্ধে বিগ স্কেলে হচ্ছে, অন্যভাবেও হচ্ছে। কোনো ব্যক্তির দরকার হলে তারও নিশ্চয় খুন করার অধিকার আছে।

ফাঁসির আইনটা তবে অনুচিত ?

তা কেন হবে ? আইনটাও দরকার। কোনো প্রয়োজন নেই, ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, শুধু কথা কাটাকাটি হতে হতে একজন আরেকজনকে খুন করে বসলে তো চলবে না। ব্যক্তির পক্ষে দরকারি হওয়া চাই খুন করাটা। ব্যক্তি নিজের অধিকার খাটাতে রিস্ক নেবে, জীবন পণ করবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার মানেই তাই। আইন দিয়ে এটা কনট্রোল করা হয়। রাস্তায় নেকেড হয়ে নাচবার অধিকারও প্রত্যেক ব্যক্তির আছে— কিন্তু মদ গাঁজা খেয়ে খেয়াল হল আর রাস্তায় নেচে দিলাম, এটা তো আর ব্যক্তি স্বাধীনতা নয়। রাস্তায় ওভাবে নাচলে দশজনে আমায় উন্মাদ ভাববে, গায়ে থুথু দেবে কাদা ছুঁড়বে—এ সব জেনেও, এ সব ফেস করেও যদি কেউ ও রকম করতে চায় নিশ্চয় তার সে স্বাধীনতা আছে।

সুনীল হেসে বলে, সে তো সব দেশেই আছে। শাস্তি পাবে জেনেও কেউ যদি আইন ভাঙে, তাকে ঠেকাবে কে ? কিন্তু শাস্তি দেবার আইন থাকা চাই, আইনটা খাটানো চাই। এই পয়েন্টটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। চোর-ডাকাত গায়ে ফু দিয়ে বেড়ালে সেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রমাণ হয় না।

সবাই তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অজানা গলির মোড়ে বড়ো রাস্তার গোড়া বাঁধানো বটগাছটার তলে।

লাল সিমেন্টের গোল চত্বর গাছটার গোড়ায়, অনেকে বসতে পারে। এক দিকে ছেলেখেলার মন্দিরের মতো একটা মন্দিরে শিবঠাকুরের ফটো সামনে চত্বরে কিন্তু শ্বেতপাথরের বিশ্রামরত ষাঁড জাবর কাটা ভুলে গিয়ে যেন ষাঁড়টি মন্দিরের শিবঠাকুরের ফটোটার দিকেই স্থির চোখে চেয়ে আছে।

মিলনী রাগ করে বলে, তোমরা তর্ক করো, আমি বাড়ি যাই। আমার এটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চয় আছে।

সুনীল বলে, না, নেই। মেয়েরা ব্যক্তিই নয়, তাদের আবার ব্যক্তি স্বাধীনতা কী ? আমি বরং কেটে পড়ি, তর্ক থেমে যাবে।

বলেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় শহরতলি স্টেশনটার দিকে। কিছু বছর আগেও এ অঞ্চলটাকে শহরতলি বলা চলত, আজ শহরে পরিণত হয়েছে, একাকার হয়ে গেছে শহরের সঙ্গে।

ডোবাপুকুর, খোলার ঘর, ইটের দালান, কংক্রিটের সিনেমা হাউস জড়াজড়ি করে আছে।

লণ্ঠনের পাশে নয়, ইলেকট্রিক লাইটের পাশে শুধু লণ্ঠন জ্বলে না, প্রদীপও একটা জ্বলে। একটা মোটরের হেডলাইট জ্বালিয়ে অন্য আরেকটা মোটর যে কারখানায় মেরামত হয়, তারই পাশে ছোটো চালাঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাভারত পড়তে পড়তে সরকারের পেনশনপ্রাপ্ত পিয়ন জগৎ মাঝে মাঝে চোখ তুলে অসময়ে নতুন করে পাতা সংসারের দিকে তাকায়। সারাদিন রোজগারের ধান্ধায় ঘুরে কেটে যায়। এই মহাভারত পড়ার সময় সে রোজ ভাবে পেনশনের জোরে ঝোকের মাথায় আবার বিয়ে করার সময় যদি জানা থাকত যে আগে দিনের বেতনের হিসাবে তার পেনশন পাওয়া না পাওয়া এভাবে প্রায় সমান হয়ে যাবে।

সুনীল চালাঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে, জগৎ বাড়ি আছ ?

আজ্ঞে যাই।

শিথিল ঝিমধরা একটা নড়বড়ে মানুষ সামনে এসে দাঁড়ায়। পরনে তার হাফপ্যান্ট।

সুনীল বলে তোমার ছেলের কাজের কথা বলেছিলে না ? আজ এগারোটার সময় আমার আপিসে পাঠিয়ে দিয়ো।

ভালো করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে জগতের। জীর্ণ শিথিল দেহে বোধশক্তিটাই হয়তো এমনভাবে ঝিমিয়ে গেছে, যে কিছুই আর তাকে নাড়া দিতে পারে না।

দাওযায একটা পিঁড়ি পেতে দিযে বড়া বলে, বাবুকে বসতে বল ?

না, আব বসব না।

মুখখানা এখনও কচিই আছে বলা যায। আবও কচিবযসে জগতেব পেনশনেব অন্নে পেট ভবাতে এসেছিল।

আগেব সে দিনকাল থাকলে দশ-পনেবোবছব পেট ভবাবাব আশা মিটত। তিন-চাববছবেই জগৎ শেষ হয়ে এসেছে, একটা বছবও আব টিকবে ভবসা নেই।

জগতেব ছেলে শ্রীপদ যদি তখন খেতে পবতে দেয।

আগে সুনীলেবা কাছেই একটা বাড়িতে থাকত। জগৎ বাজাত বাঁশেব বাঁশি– -গেঁযো টানা সুবে। তাব বাঁশি শুনতে শুনতে বাঁশি বাজানো শিখবাব শখ হয সুনীলেব।

জগৎ অবশ্য তাব গুবু নয ! বাঁশি শেখাব প্রেবণা জুগিযেছিল শুধু এটাই তাব ছেলেকে চাকবি জুটিয়ে দেবাব কাবণ।

জগৎ তাদেব অত্যন্ত অনুগত ছিল। ফুটফবমাশ খেটে বখশিস পেত—পেনশন নেবাব পব কিছুদিন তাদেব এখনকাব বাড়িতে চাকবেব কাজও কবেছিল।

তাবপবেও মাঝে মাঝে দেখা কবে এসেছে—শুধু আনুগত্য জানিযে আসাব জন্য।

সুনীল কিন্তু ভাবে, জগতেব সেই বাঁশেব বাঁশিব কথা ভেবেই কি তাব ছেলেব জন্য চেষ্টা কবে চাকবিটা জুটিয়ে দিল · এই ভাবপ্রবণতাই হযতো তলে তলে তাকে প্রভাবিত কবেছে !

বহুকাল পবে আজ সে জগৎকে জিজ্ঞাসা কবে, তোমাব সেই বাঁশি দুটো আছে জগৎ ?

আজ্ঞে, বাঁশি ? বাঁশিব পাট কবে চুকে গেছে বাবু। ছেলেপিলেবা নিযে ভেঙে দিযেছে।

সুনীল দেখতে পায, বড়া একদৃষ্টে তাব মুখেব দিকে চেযে আছে !

তাব ম্লানমুখ আব কবুণ চাউনি দেখে জগতেব উপব সুনীলেব বাগ আব বিতৃষ্ণাব যেন সীমা থাকে না।

পথে নেমে গিযে কিন্তু তাব মনেব ভাব পালটে যায।

জগতেব দোষ নেই।

সে তো শুধু প্রথা মেনে গিযেছে।

তাবা নয অন্যভাবে চিন্তা কবতে শিখেছে—জগতেব চেতনা তো আব পালটে দেযনি !

৬

মাসকাবাবে সুনীল আপিস থেকে ফিবছে, মুদিখানাব গগন ডেকে বলে, স্লিপ ক-টা নিযে যাবেন বাবু।

কীসেব স্লিপ গগন ?

গগন আশ্চর্য হযে বলে, স্লিপ পাঠিযে সিগাবেট নিযেছেন না ? আপনাব ভাই নিযে গেছে। দেখি স্লিপগুলি।

সবগুলিই সিগাবেটেব স্লিপ, সই কবা আছে তাব নাম। তাব নাম জাল কবাব কাবণ সুনীল বুঝতে পাবে। সিদ্ধেশ্ববেব দোকানে আসা যাওযা আছে, কিন্তু এই দোকানেব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক নেই—সে সহজে টেব পাবে না।

সহজে না হলেও টেব যে সে পাবে এটা অবশ্য জানাই ছিল অমিযব। জেনেও গ্রাহ্য কবেনি, বেপবোযা হযে তাব নাম জাল কবেছে।

অমিয়র দোকানের ধারটা মিটিয়ে দেবার পর দু-তিনদিন অমিয় একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, মুখ তুলে তার মুখের দিকে চাইতে পারেনি। তার শঙ্কিত ভাব দেখে বোঝা গিয়েছিল সে প্রতি মুহূর্তে শাসনের প্রতীক্ষা করছে।

সুনীলের আশা হয়েছিল, রেণুর কথাই ঠিক হবে, অমিয় আর ও রকম কাজ করবে না।

এ যে একেবারে উলটো ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল ! অমিয় এক রকম তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে যে এই রকম ছলচাতুরী করে সে সিগারেট ফুঁকবেই !

অমিয় বাড়ি ছিল না। ফিরে আসে প্রায় ন-টার সময়।

সুনীল তাকে ঘরে ডেকে স্লিপগুলি তার হাতে দিয়ে বলে, এ সব কী আরম্ভ করেছ ?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সুনীল এবার গর্জন করে ওঠে। চুপ করে থাকলে চলবে না। কোন দেশি বজ্জাতি এ সব ? এর নাম জুয়াচুরি তা জানিস ?

অমিয় ধীরে ধীরে বলে, আমি কী করব ? আমি কি ছোটো ছেলে আছি ? আমায় পয়সা দেবে না—

প্রায়ই তো নিস দু-একটাকা মা-র কাছ থেকে।

তাতে কী হয়। সব ছেলে হপ্তায় তিন-চারবার সিনেমা দ্যাখে, অন্য খরচও করে। আমার কোনোটা কুলোয় না। একদিন একটা টাকা দিলে মা আব সহজে দিতে চায় না। এক টাকায় কী হয় আজকাল !

আমি যে সিনেমাও দেখি না, সিগারেটও খাই না ?

অমিয় চুপ করে থাকে।

গরিবের ছেলেরা কী করে সপ্তাহে তিন-চারবার সিনেমা দ্যাখে, এত টাকার সিগারেট খায় ? একটু দুধ না পাওয়ায় বাবার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। তোমার পেছনে কত খবচ হয় হিসাব করেছ ? তবু দু-চারটাকা হাতখরচের জন্য যা দেওয়া হয়, তাই তো যথেষ্ট ! কত ছেলে আছে টুইশনি করে পড়ার খরচ তোলে।

অমিয় হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আমার যে রকম নার্ভাস স্ট্রেইন চলেছে—

সুনীল ভাবে, সেরেছে। অমিয় আবার বলে না বসে যে আমি প্রেমে পড়েছি !

কেন ?

আমি ফেল করে যাব।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী কথা ? এখনও ছ-সাতমাস বাকি পরীক্ষার, এখন থেকে ফেল হয়ে যাবি ভাবছিস কেন ?

যে রকম পরীক্ষা করেছে, যত পার্সেন্ট পাস করছে, আমি জানি ঠিক ফেল করে যাব। পড়া ম্যানেজ করতে পারি না, গোলমাল হয়ে যায়।

কেন ? তুই তো বেশি না পড়েও ভালোভাবে পাস করে এসেছিস ?

সে তো আগে করেছি। পাস করার জন্য কী করে পড়তে হয় জানতাম। এবার বুঝতেই পারছি না কী করে পড়ব।

মানুষ পড়ে আবার কী করে ? মন দিয়ে বুঝে বুঝে পড়ে যায়—পড়ার আবার অন্য নিয়ম আছে নাকি ?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে, নিজে নিজে বুঝে পড়া যায় না।

সুনীল বলে, আচ্ছা তুই এখন যা।

অমিয় খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, আর করব না।

সুনীল অনুভব করে, ভাইকে কী বলবে তার জানা নেই ! সমস্যাটা ভালো করে না বুঝে তাকে কোনো আশা বা আশ্বাস দেওয়া,—এখন থেকে তাব ফেল কবার চিন্তা দূর করা—অসম্ভব।

রেণুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতেই হবে।

অমিয়র একটা কথা সে বুঝেছে—নার্ভাস স্ট্রেইন ! নিজে যখন ছাত্র ছিল তখন বুঝতে পারত না, আজকাল ছাত্রদের স্নায়ুর উপরে সত্যই কী অসম্ভব চাপ পড়ে—ছাত্রজীবনের কথা মনে করলে আজ মোটামুটি বুঝতে পারে।

বেশির ভাগ ছাত্রের মাথা কেন বিগড়ে যায় না এটা সত্যই আশ্চর্য !

রেণু বলে, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনাদের চেয়ে ওদেব অবস্থা হয়েছে ঢের বেশি কঠিন, ওরা নিজেদের সমস্যা অনেক বেশি বুঝতে শিখেছে। গুরুজনগিরি না করে ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহাব করা দরকার।

সুনীল বলে, আমি ভাবছি বন্ধুর মতোও নয়, শত্রুর মতোও নয়—নতুন কোনো রকম ব্যবহার না করাই ভালো। এতদিন যেভাবে ব্যবহাব করে এসেছি হঠাৎ সেটা পালটে দিলে ফলটা হয়তো উলটো হবে।

কিছু তো বলতে হবে করতে হবে আপনাকে ?

সুনীল সায় দিযে বলে, আমি ভাবছি সোজা বলে দেব, পাস যখন করতেই পারবে না, মিছামিছি পড়ে লাভ কী। পড়া বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। ফেল করার ভাবনা ওকে এত কাবু করেছে কেন আমি জানি। বেচারা আমাদের কথাই ভাবছে। আমরা সবাই এত কষ্ট করছি তবু ওকে পড়াবার জন্য এত টাকা খরচ করছি, ও ভাবছে ফেল করলে ভয়ানক একটা অপরাধ করা হবে। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকাব যে আমরা শুধুই ওকে ভালোবেসে ওর জন্য ত্যাগস্বীকার করছি না—পাস করে চাকবি করে পড়াবাব খরচটা উশুল করে আনবে এটাও আমবা আশা করছি। একটা শক লাগবে। ফলটা ভালো হবে।

রেণুব চাউনি দেখে সত্যই তার বোমাঞ্চ হয !

খুব খাপছাড়া কথা বললাম, না ?

রেণু প্রায় ভর্ৎসনার সুবে বলে, এতকাল এ বকম খাপছাড়া কথা শুনিনি কেন তাই ভাবছি। নিজের ভাইটিকে নিযে যেই বিপদে পড়লেন, দিব্যি গড়গড় করে বেরিয়ে এল কথাগুলি। আমি যে কত বিষয়ে কত কথা বলতে গিয়েছি—

রেণু হঠাৎ থেমে যায়। আজই বোধ হয় প্রথম সুনীলের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার সময় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

সুনীল যেন ভয়ে পেয়ে যায় লজ্জায় তার মুখ লাল হতে দেখে। ভাইয়ের ব্যাপার এত বোঝে কিন্তু রেণুর আবেগ-উন্মাদনা যেন তার কাছে দুর্বোধ্য অস্বস্তিকর ব্যাপার।

নিশ্বাস ফেলে সে বলে, কী জানেন, আপনি শক্ত হাতে জীবনের হাল ধরেছেন, আমার মনটা বড়ো দুর্বল। ভাইকে একটা থাপ্পড় মারা উচিত ছিল, তার বদলে ভাবতে বসেছি কী করে ছোঁড়ার একটা গতি করা যায়।

আপনার এই ধরনের ঠাট্টা-তামাশাগুলি বড্ড গায়ে লাগে। ব্যাটাছেলের কাজ করছি বলে আমি কি মেয়েমানুষ নই ?

তাই কি বললাম আমি ?

বলার রকমে বুঝতে পাবি। অত বোকা নই।

বোকা ? রাম রাম ! বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে আছেন। বুদ্ধি দিয়ে সব চালাচ্ছেন।

এর নাম ঝগড়া। এব নাম কলহ। কিন্তু এ তো আর দাম্পত্যকলহ নয় যে অনায়াসে লঘু ক্রিয়ায় পরিণত হবে—স্ত্রী বেচারার উপায়ান্তর না থাকার জন্য !

রেণু তাই বলে, আমি বোকা হলেই আপনি খুশি হতেন জানি। মিলনীর বুদ্ধি নেই, শুধু বাপেব টাকা আছে, মিলনীব মতো আমার কেন বাপের টাকা নেই, শুধু বাঁচবার বুদ্ধি আছে, এটা আপনার বড্ড খারাপ লাগছে।

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনার টাকাটা কালকেই দিয়ে যাব। চান তো আজকেও দিতে পারি।

রেণুও উঠে দাঁড়িযে বলে, আপনি ছোটোলোক !

সুনীল রাস্তায় নেমে অনুভব করে মিলনীই যেন আগাগোড়া তাকে টানছিল, মিলনীর আকর্ষণেই সে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে।

গেট খোলা ছিল। দারোয়ান আজ তাকে সেলাম দেয।

মিলনী প্রায় এক ডজন বান্ধবী নিয়ে ব্যস্ত ছিল

ড্রয়িংরুমে ভিড় দেখেই সুনীল ভাবে, তাই তো ! এবার কী করা যায় ?

মিলনী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আসুন আসুন—আপনি আসবেন ভাবতেও পারিনি সুনীলদা। বাঁশি এনেছেন তো ? তা আনবেন কেন !

সকলেই অপরিচিত। সকলে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

মিলনীর বান্ধবীদের বেশভূষা সুনীলকে আশ্চর্য কবে দেয।

সকলের গায়েই প্রচুর গয়না—পরস্পরেব তুলনায় কেবল কমবেশি হবে। দেখেই বোঝা যায কুমারী ও বিবাহিতা সকলেই এরা সেকেলে গোঁড়া ধনী পরিবাবের মেয়ে।

মিলনীর সঙ্গে তাদের বেশভূষার পার্থক্যটা খুবই প্রকট।

সুনীল বলে, আজ ব্যাপার কী ?

মিলনী বলে, ব্যাপার কিছু নয়, এরা আমার পুবানো বন্ধু, বোনটোনও আছে। এমনি নেমন্তন্ন করেছি।

তবে আমাব পালানোই উচিত !

মিলনীর সম্পর্কে একটা প্রশ্ন সুনীলের মনে ছিল কিন্তু সে জবাব খোঁজেনি। আজ আপনা থেকেই জবাবটা খুঁজে পায়।

প্রশ্নটা ছিল এই যে এত বযসে মিলনী কেন স্কুলে মোটে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে !

আজ তার খেয়াল হয় যে পাঁচ-সাতবছর আগেও অবিনাশ ছিল সাধাবণ সেকেলে চালচলনের ব্যবসায়ী, বাড়ির মেয়েরা যাদেব অন্তঃপুরেই আটক থাকে এবং রামায়ণ মহাভারত পড়া আর মোটা মোটা গোটা গোটা অক্ষরে চিঠি লিখতে শেখাই যারা মেযেদের পক্ষে যথেষ্ট লেখাপড়া হয়েছে মনে করে !

যুদ্ধের বাজারে ঘোষালের সঙ্গে একদিকে অবিনাশ যেমন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ঘোষালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবলম্বন করেছে অ্যারিস্টোক্রেটিক চালচলন।

মিলনী স্কুলে ভর্তি হয়েছে অনেক বয়সে।

আধুনিক সভ্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এলেও, অনাদির মতো ছেলের সঙ্গে বিয়ে স্থির হলেও, মাঝে মাঝে অতীত জীবন আর পুরানো সঙ্গিনীদের জন্য তার মন কেমন করে।

তাই এমনিভাবে তার বর্তমান জগতের সকলকে বাদ দিয়ে সে শুধু পুরানো বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করে এনে আড্ডা জমায় !

পরদিন ভোরে বেড়াতে যাবার সময় দেখা যায় গেটের সামনে মিলনী দাঁড়িয়ে আছে।

বলে, কাল কিছু বলতে এসেছিলেন নিশ্চয়। তাই ভাবলাম ভোরে বেড়াতে যাবার সময় শুনতে হবে কথাটা। আমারও একটু বেড়ানো হবে।

এমন খুশি হয় সুনীলের মনটা যে, সে নিজেই যেন আশ্চর্য হয়ে যায়। এ রকম মনের গতি হওয়া তো উচিত নয় তার।

বিশেষ কোনো কথা বলবার ছিল না। এমনি গল্প করতে এসেছিলাম।

শুনে মিলনীকেও অত্যন্ত খুশি হতে দেখা যায়।

সে বলে, বলেন কী ! আমার সঙ্গে গল্প করতে !

এটা তোমার বিনয় না তামাশা ?

দুটোই। আমি কি সত্যি সত্যি ভাবছি আমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছা হওয়াটা খাপছাড়া কিছু ? বিদ্যে কম বলেই কি একজনের সঙ্গে কথা কইতে ভালো লাগবে না মানুষের ! আমারও আপনাকে খুব ভালো লাগে।

বাঁশি বাজাতে ...নি বলে ?

না, এমনি। সাধারণ বাঁশি বাজিয়েদের মতো নন বলে। সে রকম লোক হলে কি এভাবে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেতাম ? জানি যে অন্য রকম কিছু আপনার মনে আসবে না। আপনাকে ভালো লাগে এটাই শুধু ভাববেন।

সুনীল হেসে বলে, কেন ? অন্য রকম কেন ভাবব না আমি ?

মিলনীও হেসে বলে, ও রকম আজগুবি ভাবনা আপনার আসবে না বলে ! একজনের ভালো লাগাকে ভালোবাসা মনে করে নিজেকে ভোলাবার মতো বোকা আপনি নন। প্রথম দিন আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম।

ভালো লাগা থেকে কিন্তু ভালোবাসা হতে পারে !

সে যদি হয় তখন দেখা যাবে। তাতে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। '

বলো কী ! আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, তবু বলছ ভয় পাবার কিছু নেই ?

আমি কেন ভয় পেতে যাব ? আমি বরং বুঝতে পারব ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভয় পাবে আরেকজন।

মিলনী একটু থেমে বলে, কী জানেন, এত রকমের এতজন আমায় ভালোবাসাবার চেষ্টা করছে, এখনও কেউ কেউ করছে, যে এ ব্যাপারে আমি পেকে গিয়েছি। সব বুঝতে পারি। তাই আর মাথাও ঘামাই না। চেষ্টা করে যে ভালোবাসানো যায় না এটুকু যারা বোঝে না তাদের মতো বোকা কেউ আছে ?

সুনীল বলে, চেষ্টা করে ভালোবাসানো যায় না ঠিক তবে ওর মধ্যে একটা মস্ত কিন্তু আছে। এটা হল আসল ভালোবাসার কথা। এটা জাগানো যায় না, কিন্তু চেষ্টা করে একজনের মধ্যে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া সম্ভব যে ভালোবাসা জন্মেছে। পরে ভুল ভাঙবে কিন্তু সে তো আলাদা কথা।

এ রকম আর ক-টা হয় ?

এ রকমটাই বেশি হয়। সবাই যে সজ্ঞানে চেষ্টা করে ভুল ধারণাটা জন্মায় তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে দাঁড়ায় তাই। নইলে বেশির ভাগ ভালোবাসা বাস্তবের ধোপে টেঁকে না কেন ?

ভোরের আলো স্পষ্ট হয়েছে। বাঁশ বোঝাই গোরুর গাড়ি চলেছে আড়তের দিকে—রাত্রি থাকতেই গাঁ থেকে রওনা দিয়েছিল টের পাওয়া যায়। মলিন বেশে দৃঢ়পদে মেয়েপুরুষ খাটতে চলেছে।

পাশাপাশি চলতে চলতে কলহ করে চলেছে শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরা একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে আর সস্তা তাঁতের শাড়ি পরা একটি অল্পবয়সি বউ।

বউটি বলছে, পিছু পিছু এসো না বলছি মোর ! এখনও ফিরে যাও বলছি। তেমন মেয়ে পাওনি মোকে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

ছেলেটি বলছে, ফিরে চল বলছি—হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব।

সুনীল আর মিলনী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মিলনী আস্তে হাঁটছিল, ওরা এসে তাদেব নাগাল ধরেছে।

মেয়েটি বলে, লবি বাস যেটা আসবে এবার সামনে ঝাঁপিযে পড়ব বলছি !

ছেলেটি বলে, আচ্ছা, বেশ, চ তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মোর পা আছে, নিজে যেতে জানি।

তোকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসব।

মেয়েটি আর কিছু বলে না।

দুজনে অল্পে অল্পে তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

সেদিন ফুল তোলা হয় না সুনীলের।

সে জন্য মনটা খুঁতখুঁত করে না।

অন্যদিক দিয়ে অস্বস্তি আর অশান্তি বাড়তে থাকে বেলা বাড়ার সঙ্গে। একটা সিদ্ধান্ত ধীবে ধীরে সুস্পষ্ট সত্যের রূপ নিতে থাকে।—মিলনী আর নিজের সম্পর্কে একটা গুবুতর সিদ্ধান্ত।

সবদিক ভেবে-চিন্তে কথাটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে ঠিক করতে পাবে না সত্যটা অপ্রিয় হবে কি না, নিজের কাছে নিজে ছোটো হয়ে যাবে কি না এই সত্যটাকে স্বীকাব কবতে হলে।

প্রথমে প্রশ্নের রূপ নিয়ে এসেছিল কথাটা। মিলনীকে যে তাব এত ভালো লেগেছে তাব কারণ কি এই যে মেয়েটির সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো রকম জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এ আশঙ্কা করাব প্রয়োজন নেই ?

মিলনী আর অনাদির মিলন স্থির হয়ে আছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে, অনাদিব তুলনায সে অতিশয় তুচ্ছ মানুষ, তার দিকে অন্যভাবে মিলনী ফিরেও তাকাবে না। সে অনায়াসে প্রাণ খুলে মিলনীর সঙ্গে মিশতে পারে, এমনকী ভালোবাসা পর্যন্ত জানাতে পাবে তাকে—কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে মিলনী তাকে প্রশ্রয় দেবে না, হয়তো তাকে বেদনা দেওয়ায় দুঃখে একটু কাঁদবে কিন্তু তার ভালোবাসাকে মেনে নিয়ে তাকে বিপদে ফেলবে না কিছুতেই।

মিলনী যেমন নিশ্চিন্ত তাব সম্পর্কে যে হাজার হাসিখুশি প্রাণখোলা মিষ্টিকথা দিয়ে মিশলেও, আবছা ভোরে তার প্রতীক্ষায় বাগানের গেটেব সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও, তাকে যে মানুষ হিসাবে বন্ধু হিসাবে খুব ভালো লেগেছে এটা সরলভাবে জানতে দিলেও—সে কখনও একটা সুযোগ পেয়ে তার হাত চেপে ধরে গদগদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করে তাকে বিপদে ফেলবে না। সেও তেমনি নিশ্চিন্ত যে একেবারে হাত ধরে টেনে বুকে চেপে ধরলেও মিলনীর দায় ঘাড়ে দেবার তার প্রয়োজন হবে না।

লতা বলে, নাইতে যাবে না ? ন-টা যে বাজতে যায় ! বাবা নেয়েখেয়ে জামাকাপড় পরছে।

শরীরটা ভালো লাগছে না লতা।

শুনে লতা যেন আঁতকে ওঠে।

প্রায়ই যে অসুখে ভোগে, প্রায়ই যে বলে শরীরটা ভালো নেই, তার মুখে এ কথা শুনতে অভ্যাস হয়ে যায় সকলের। কয়েক বছরের মধ্যে যে সর্দি-কাশি ছাড়া কোনো রোগে ভোগেনি, সর্দি-কাশিতেও সম্বৎসরে ভুগেছে কদাচিৎ দু-একবার, সে যখন হঠাৎ বলে শরীরটা ভালো নেই, তখন আঁতকে যাবার কথাই স্নেহশীলা কৃতজ্ঞ বোনটার।

দু-একমিনিটের মধ্যে সমগ্র পরিবারটি একসঙ্গে এসে ঘিরে ধরে।

রাস্তায় কোনো মানুষ অ্যাকসিডেন্টের কবলে পড়লে রাস্তার আত্মীয় মানুষরা যেভাবে তাকে ছেঁকে ধরে।

সিদ্ধেশ্বর বলে, কী হয়েছে ?

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে বলে, কী আবার হবে ?

তোমার নাকি শরীর খারাপ ?

গামছাটা টেনে কাঁধে ফেলে ভিড় ঠেলে নাইতে যেতে যেতে সুনীল বলে, শরীর মানুষের ও রকম একটু খারাপ হয়। তোমরা পাগলামি কোরো না।

স্নান করে খেয়ে সে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, লতা এসে বলে, আমায় এমন লজ্জা দিলে কেন দাদা ? এর চেয়ে নিজেই জুতো মারলে পারতে !

জুতো পরতে পরতে সুনীল বলে, জুতো নয়, আরেকটু ছোটো হলে তোর কান মলে একটা চাপড় কষিয়ে দিতাম। তোর কাছে আমার শরীর খারাপ হয়েছে বলার পর্যন্ত জো নেই ! বাড়িতে তুই হট্টগোল বাধিয়ে দিবি ! তোর দাদা-ভক্তির চোট সইতে আধঘণ্টা আগে আপিসে যেতে হল।

লতা ধীর শান্তকণ্ঠে বলে, ফিরে এসে হয়তো দেখবে আমিও যমের আপিসে চলে গিয়েছি।

মনের দুঃখে ?

আমার অসুখ হতে পারে না ?

অসুখ হলেই যমের আপিসে যেতে হয় নাকি ? কী অসুখ হল তোর আবার ?

লতা একবার চোখ বোজে।

থেকে থেকে আমার বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। তুমি বকলে আমার বুকের মধ্যে এখন কেমন করছে তুমি বুঝবে না।

সুনীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, বুক ধড়ফড় করে ? বকলে-টকলে করে, না নিজে থেকে করে ?

নিজে থেকে করে ! বসে আছি, হঠাৎ কেমন চমকে যাই, বুকটা ধড়াস করে ওঠে, তারপর খানিকক্ষণ ধড়ফড়ানি চলে। ভীষণ ভয় ভয় করে।

লতা আবার চোখ বুজে বলে, হঠাৎ হার্টফেল করে মরে যাব দেখ।

কদ্দিন এ রকম হচ্ছে ?

অনেকদিন। আগে কম হত আজকাল আরও বেড়েছে।

অ্যাদ্দিন বলিসনি কেন ?

বলিনি ? মা-কে কতদিন বলেছি। মা কানেই তোলে না, বলে, এ সব বয়সকালের ন্যাকামি। খাই দাই হেঁটে-চলে বেড়াই, আমার আবার অসুখ কীসের ?

আমায় বলিসনি কেন ?

তুমি কোনোদিকে তাকাও না, তোমায় আবার কী বলব !

সুনীল একটু ভেবে বলে, যা তুই শুয়ে থাকবি যা। এখুনি ডাক্তার এনে তোকে দেখাব।

আপিস যাবে না ?

না।

পাড়ার ডাক্তার। নাম সত্যশরণ। বয়স বেশি নয়, অল্পসময়ে পশার ভালো জমিয়েছে।

গরিবেরা তাকে ডাক্তার হিসাবে পছন্দ করে। একটা গুণ আছে সত্যশরণের, রোগের সঙ্গে রোগীর অবস্থা খানিকটা বিবেচনা করে সে ব্যবস্থা দেয়।

বিবরণ শুনে সত্যশরণ বলে, খুব সম্ভব নার্ভের গোলমাল, হার্টের নয়।

লতাকে পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের পর সে রায় দেয়, হার্ট ঠিক আছে।

লতা বলে, তবে বুক ধড়ফড় করে কেন ?

সত্যশরণ একটু হাসে। হার্ট খারাপ না হলেও অন্য কারণে পালপিটেশন হয়। বদহজমের জন্য হয়, রক্ত কমে গেলে হয়, অন্য অসুখ থেকে হয়—বেশি চা-কফি খেলে পর্যন্ত হতে পারে।

সুনীল বলে, নড়াচড়া বাদ দিয়ে সারাদিন পড়লেও হতে পারে।

না পড়লে যে ফেল হয়ে যাব !

ব্যবস্থা হয় হালকা পুষ্টিকর খাদ্য, ঘরের কাজ কিংবা বেড়ানোর পরিশ্রম, ঘুম এবং দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে আনন্দে থাকা।

ডাক্তার বিদায় হয়ে গেলে সুনীল বলে, তোর আর পড়ে কাজ নেই।

লতা আঁতকে ওঠে।

না না, পড়া ছাড়ব কেন ? দ্যাখো না দুদিনে সেরে যাচ্ছি। হার্টের অসুখ তো নয় !

ডাক্তার আসবার আগেই সিদ্ধেশ্বর আপিসে চলে গিয়েছিল। বাড়িতে ডাক্তার এসেছে, ফি দিতেই হবে, লতাকে দেখা শেষ হলে সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় বলত, আমার হার্টটা একটু দেখুন তো ডাক্তারবাবু !

লতার চেয়ে তার হার্ট পরীক্ষা করাই জরুরি ছিল বেশি।

সেদিন রাত্রে বাঁশি বাজিয়ে শোবার আগে কলঘরে যাবার সময় লতাদের শোবার ঘরে কান্না শুনে থমকে দাঁড়ায়।

শুনতে পায় রাণী বলছে, রাতদুপুরে কাঁদছিস কেন দিদি ?

পিসি বলে, হল কী তোর ? দিব্যি শুয়েছিলি, হঠাৎ কান্না শুরু করলি যে ?

লতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, দাদার বাঁশি শুনে ঘুম আসে না, না ঘুমোলে অসুখ সারবে না, দাদা পড়া ছাড়িয়ে দেবে।

৭

রেণু জিজ্ঞাসা করে, সাত-আটদিন বাঁশি শুনছি না যে ?

বাজাই না।

কেন ?

বোনের হুকুম।

ব্যাপার শুনে বেণু বলে, আপনি এই ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দিলেন ? বাঁশি শুনে কখনও ঘুম নষ্ট হয় ?

অবস্থা বিশেষে হয়। বাঁশির জন্য নয়, আতঙ্কে।

বাঁশি শুনে আতঙ্ক ?

সুনীল বলে, বাঁশি শুনে ঘুম আসছে না, ঘুম না এলে অসুখ সারবে না, অসুখ না সারলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

আসল আতঙ্ক পড়া বন্ধ হবার ?

সুনীল মাথা নাড়ে।

আসল ভয় হল বিয়ের। ঠিক বিয়েরও নয়— যেমন তেমন একজনের সঙ্গে বিয়ে হবার ভয়। চারিদিকে দেখছে তো বিয়ে করে সাধারণ লোকের কী অবস্থা– ওই ভয়ে নিজের দাদা তার বিয়ে করছে না। পড়া বন্ধ হলেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। বাপ ভায়ের টাকা নেই, ভালো ছেলে জুটবে না।

বেণু আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি এত তলিয়ে বোঝেন ?

সুনীল বলে, এ আর বোঝা কঠিন কী ? দেখছি তো চোখের সামনে। ওর কি আর পড়ার জন্য পড়া ? নিজেকে বাঁচাবার জন্য পড়া। রাত জেগে পড়ত আজকাল একটু সকাল সকাল শোয় কিন্তু ঘুম আসে না ওই জন্যই। ও ভাবে আমার বাঁশির জন্য ঘুম আসে না।

বুঝিয়ে দেননি ?

বুঝিয়ে লাভ নেই। বরং উঠে পড়ে লেগেছে শরীরটা ঠিক করার জন্য রাত্রে ঘুমোবার চেষ্টা করছে তাই করুক। ক দিন পরে বাঁশি শুনতে শুনতে ঘুমোতে পারবে।

বেণু খানিক চুপ করে থেকে খেদের সঙ্গে বলে, সত্যি কী অবস্থা দেশের ছেলেমেয়েদের।

শুধু ছেলেমেয়েদের কেন ? তবে অবস্থা যেমনি হোক, এ লক্ষণটা ভালো।

কোন লক্ষণ ?

এই যে নিজেদের হাল ধরবার চেষ্টা। লতা শুধু বাপ ভাই আর অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়ে বসে নেই, নিজেই লড়াই করছে। সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে তো, কেউ বলে ও দেয়নি কিছু। নিজেই অবস্থা আঁচ করে ব্যবস্থা করছে। নিজে লড়াই না করলে আমরা কি আর ওকে পড়াতাম ? কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ভাই বোন সবাই আপনারা বিয়ে বিরোধী।

এক কারণে।

বেণু মাথা নাড়ে– –না, তফাত আছে। বোনটি ভাবছেন শুধু নিজের কথা, আপনি ভাবেন ওদের সকলের কথা। একা হলে আপনি কি আর বিয়ে করতেন না।

সুনীল একটু হাসে।

আপনারা সবাই ওই এক ভুল করেন আমার সম্পর্কে। ভাবেন না আপনজনদের জন্য ত্যাগ করছি। আসল কথা কিন্তু মোটেই তা নয়। বিয়ে করার ইচ্ছা দূরে থাক, ও কথা ভাবতেও বিতৃষ্ণা বোধ হয়। আমার ধাতটাই এ রকম। কোনো শারীরিক বা মানসিক কারণ নিশ্চয় আছে। কোনো রকম অ্যাবনর্মাল সেক্স টাইপ হব হয়তো।

কথা শেষ করেই সুনীল হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনার—?

বেণু মুখ বাঁকায়।

ইচ্ছে তো হয়। কিন্তু পছন্দমতো মানুষ পেলাম কই ?

দুজনে তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। রেণুর হাসিটা হয় একটু করুণ আর লাজুক।

রেণুর মধ্যে অল্প অল্প পরিবর্তন ধরা পড়ে সুনীলের কাছে। যেমন ওই করুণ ও লাজুক হাসি। এ হাসি সুনীল কখনও আর দ্যাখেনি।

সেদিন বিশ্রী কলহ হয়ে গেল—প্রায় অকারণেই। তাকে ছোটোলোক পর্যন্ত বলে বসল রেণু। অথচ পরদিন দেখা হতে এমনভাবে নিজেই সে কথা শুরু করল যেন ও সব ঝগড়াঝাঁটি কিছুই তাদের মধ্যে ঘটেনি অথবা ঘটে থাকলেও যেন কিছুই তাতে আসে যায় না !

আগে রেণু অন্তত জিজ্ঞাসা করত, রাগ করেননি তো ?

কেমন একটা বিরক্তি আর খানিকটা বিদ্বেষের ভাব অনুভব করে সুনীল। মনে হয়, তাকে ভালোমানুষ পেয়ে রেণু যেন তাকে তুচ্ছ করছে, অবহেলা করছে। একদিকে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে তাকে গাল দিয়ে ক্ষমা চাওয়াও যেমন সে দরকার মনে করে না, অন্যদিকে তেমনি আবার তাকে অনুকম্পা করে একটু আত্মীয়তা আর স্নেহ-মমতা দেখাতে চায়।

সে যেন দুঃখী বঞ্চিত মানুষ, তার কাছে একটু দয়া পেলে খুশি হবে।

নিজের সম্পর্কে পুরানো অস্বস্তিবোধটাও জোরালো হয়ে ওঠে সুনীলের।

কেন এত চুলচেরা বিচার ? কী এমন আসে যায় রেণুর কথা ব্যবহার একটু এদিক-ওদিক হলে ? দীর্ঘকাল ধরে তাদের পরিচয়, পরস্পরের জন্য তাদের কোনো দুর্বলতা থাকলে এতদিন এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার পর তা কী গোপন থাকত ? বন্ধুত্বের সম্পর্কই তাদের গড়ে উঠে নিজস্বতা আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে—প্রত্যেক বন্ধুত্বেরই যেটা থাকে।

বন্ধুত্ব ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্কই সম্ভব নয়, তারা সেটা চায়ও না।

কিন্তু তারা তো যন্ত্র নয়, মানুষ। যতই শক্ত আর সেন্টিমেন্ট-বর্জিত হোক, রেণু আবার মেয়েমানুষ, তার কথায় ব্যবহারে একটু এদিক-ওদিক ঘটলে সে কেন এমন অস্বস্তিবোধ করবে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমনভাবে মাথা ঘামাবে ?

মিলনীর সঙ্গে প্রথম থেকে কেন সে অবাধে প্রাণ খুলে মিশতে পেরেছে, এত অল্পসময়ে কেন তাদের ভাব জমেছে ও মিলনীকে কেন এত ভালো লেগেছে তার কারণটা আবিষ্কার করে কয়েকদিন সুনীল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

এতদিন জানা যায়নি কিন্তু মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মানোর পর একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার নিজস্ব একটা পছন্দ-অপছন্দের নিয়ম দিয়েই সে বরাবর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—বেশ পাকাপোক্ত বুদ্ধিমতী মেয়েদের সঙ্গে মিশতেই সে পছন্দ করে, যার ছেলেমানুষি এবং ভাবুকতা যত কম তাকে ততটা ভালো লাগে। এর মধ্যে বয়সের প্রশ্ন নেই, অল্প-বয়সি কোনো মেয়ে যদি রেণু বা মিলনীর মতো বুড়িয়ে যেতে পারে, তার সঙ্গও সে পছন্দ করবে !

সে তো নিছক একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় তবে ! এ রকম একটা ধরাবাঁধা নিয়ম নইলে পিছন থেকে তাব হৃদয়-মনকে কী করে নিয়ন্ত্রিত করে ?

কিন্তু গ্লানিবোধ খুব তাড়াতাড়িই কমে গেছে সুনীলের।

ক্রমে ক্রমে কয়েকদিনের মধ্যে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে এটা তার যান্ত্রিকতা নয়, এটাই তার জীবনের বাস্তবতা।

কারণ যাই হোক, যৌনবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান কী ব্যাখ্যা দেবে তার জানা না থাক—সংসারের ন্যাকামি-মার্কা হালকা দরদ ভালোবাসা সম্পর্কে তার মধ্যে আছে গভীর বিতৃষ্ণাবোধ। এই বিতৃষ্ণার একটা বাস্তব কারণ নিশ্চয় আছে। কাজেই যে মেয়ের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা করলে ভালোবাসার ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে দূরত্ব বজায় আর যাদের সম্পর্কে এ রকম আশঙ্কা নেই তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে প্রাণ খুলে মেশাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।

শুধু স্বাভাবিক নয় উচিতও বটে।

সিনেমা আর সস্তা বই কাঁচা মনটা যার বিকৃত করে দিয়েছে এমন একটি মেয়েকে মন খুলে মেলামেশার মধ্যে নিজের অজান্তে আশা দিয়ে উসকানি দিয়ে তারপর সরে যাবার বাঁদরামি তাকে করতে হয়নি।

একেবারে যে হয়নি তা নয়। কিশোর বয়সে একটি কিশোরীর সঙ্গে এ রকম বাঁদরামিই সে করেছিল।

তবে আজকের হিসাবে সেটা ছেলেমানুষি বলেই ধরা চলে।

বেশিদূর না এগিয়ে মেয়েটির ক্ষতির বদলে বরং সে উপকারই করেছিল। সতেরো বছরের ছেলে আর ষোলো বছরের মেয়ের মিলন কি আর সম্ভব হতে দিত দুবাড়ির মানুষেরা !

তার চেয়ে দু-চারদিন কেঁদে, বিষ খাবে বলে চিঠি লিখে, বছর খানেক পরে হয়তো একটু বিষণ্ণ মনে অন্য একজনের হাতে হয়ে বিয়ের আসরে পিঁড়িতে বসে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে সে বেঁচে গেছে !

মুনসেফের বউ হয়েছিল, আজ সে উন্নত হয়েছে সাবজজের বউয়ের পদে। হয়তো জজের বউও হয়ে থাকতে পারে ইতিমধ্যে। বছর তিনেক খবর রাখা হয়নি।

বছর তিনেক আগে সুনীল মফস্বলের এক শহরে তাকে দেখতে গিয়েছিল বুক ঠুকে। কিশোর বয়সেই একটি মেয়ের হৃদয় নিয়ে খেলা করে তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে কি না এই প্রশ্নের পীড়ন থেকে রেহাই পেতে, পদ্মা জীবনে সুখী হতে পেরেছে কি না জেনে আসতে।

পদ্মাকে সুখী দেখলে সে নিজে সুখী হবে কি না, পদ্মার জীবনে রং আর রস দুয়েরই প্রাচুর্য আছে জানলে, নিজে সে ক্ষুব্ধ হবে কি না, এ প্রশ্নও তার মনে জাগেনি।

যার জন্য এতটুকু মন কেমন করে না, ছেলেমানুষি ভালোবাসা ভুলে সে সুখী হয়েছে জানলে কখনও ক্ষোভ জাগে ?

লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরা সদ্যস্নাতা পদ্মা ফুলচন্দনের তামার রেকাবি হাতে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তুমি ? আপনি হঠাৎ এতদিন পরে ?

না, ফুল চন্দনের রেকাবি তার হাত থেকে খসে পড়ে যায়নি। কথায় ব্যবহারে টেরও পাওয়া যায়নি যে মাত্র দশ বছর আগে সে আঁকাবাঁকা অক্ষরে দলিল লিখে দিয়েছিল, সুনীলের জন্য সে বিষ খেয়ে মরবে !

স্বামী চিন্তাহরণের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলেছিল, তুমি এঁকে চিনবে না। জন্ম থেকে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে মানুষ হয়েছি, ইনি আমায় ছোটোবোনের মতো ভালোবাসতেন।

সুনীলকে বলেছিল, বসুন, চা-টা খান, আমি পুজোটা সেরে আসি।

চিন্তাহরণ খেয়েছিল শুধু একটা ডিম।

বলেছিল, ডিসপেপসিয়া ভাই—না খেলে মরে যাব তাই একটু খাই।

ভাসা-ভাসা আলাপ চলেছিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে সাগ্রহে চিন্তাহরণ একটা প্রশ্ন করছিল, তারপর আবার ঝিমিয়ে গিয়ে চালিয়েছিল ভাসা-ভাসা আলাপ।

সুনীল জিজ্ঞাসা করেছিল, কতক্ষণ লাগে পুজো করতে ?

দু-তিনঘণ্টা তো বটেই।

তারপরেই চিন্তাহরণ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, উনি এই ধর্মভাবটা কোথায় পেলেন বলতে পারেন ? বাপের বাড়িতে তো এ সব কোনো পাট নেই !

সুনীল বলেছিল, কার মধ্যে কীভাবে ধর্মভাব আসে তা কী বলা যায় ?

তা বলা কঠিন বটে। আমিও ক্রমে ক্রমে ওইদিকে ঝুঁকছি। তা সত্যিই তো ভাই, ভোগ যে করব তার জন্য ত্যাগ চাই না ? ত্যাগ ছাড়া কি ভোগ সম্ভব হয় ? একটা অতীন্দ্রিয় জগৎও তো আছে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কী জানেন ? হয়তো আমার মধ্যে ধর্মভাব জাগাবার জন্যই ভগবান আমাকে এঁর স্বামী করেছেন। দু-তিনঘণ্টা পুজো করা, তিন-চারঘণ্টা ধর্মগ্রন্থ পড়া—আমি তো দুদিন চালাতে পারতাম না। আমার সে মনের জোর দেননি ভগবান। ওঁকে আমার স্ত্রী করে পাঠিয়েছেন, যাতে আমার ওই দুর্বলতার পূরণ হয়।

আবছা ভোরে মিলনী আজও দাঁড়িয়ে আছে তার বাবাব মস্ত বাড়িওলা মস্ত বাগানের গেটের সামনে। চাঁদের আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে বেশ খানিকটা রাত্রি থাকতে থাকতে না বেরোলেও আজ প্রায় রাত্রি শেষ হতে না হতে সুনীল বেড়াতে বেরিয়েছিল।

মিলনী বলে, প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্য মনে হচ্ছে আধঘণ্টা—হয়তো পাঁচ-দশ মিনিট হবে।

একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ? লোকে কিছু ভেবে বসতে পারে তো !

মোটেই না। রাত সাড়ে এগারোটা বারোটার সময় আপনার বাড়ি গিযে হাজির হলে ববং বাড়াবাড়ি হত। তা তো আমি যাইনি !

ব্যাপারটা কী ?

তেমন কিছু না। বেড়াতে বেড়াতে আলাপ কবব ভাবছি।

হাঁটতে আরম্ভ করেই কিন্তু সে কথা শুরু করে দেয। বলে, ব্যাপারটা হল ওই মহাবিদ্বান ভদ্রলোকটিকে নিয়ে। বাবার কাছে টাকা নিয়েছিল দশ-বারোদিন আগে। কত টাকা সেটা শুনে কাজ নেই। মস্ত বিদ্বান বলেই তো বাবা আমাকে দিতে রাজি হননি ওর হাতে, বাবা বলতেন, বিদ্যাটা খাটিয়ে দেখাতে হবে। ও খুশি হয়ে মেনে নিত, বলত যে বিদ্যা আর অর্থ মিলিযেই সিদ্ধি সম্ভব। আমাকে বাবাও কিছু বলেনি, ও লোকটাও বলেনি। পরে শুনলাম, হঠাৎ এসে টাকা চায়, একটা চান্স পেয়েছে। বাবা ইতস্তত করে টাকা দিযেছিলেন। তারপর থেকে আর আসে না।

আসে না মানে ? টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে, কাজে ব্যস্ত হয়ে আসতে পারছে না !

মিলনী দাঁড়ায়। বিরাট এক বটগাছেব তলে। রাস্তার ধারে বটগাছের গোড়া কেউ একজন সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে, ঝবনায় পালিশ করা কতগুলি ছোটোবড়ো কালো পাথর রাখা হয়েছে গুঁড়ি ঘেঁষে, তাকে পড়েছে সিঁদুর আর ফুল।

মিলনী ধীরে ধীরে বলে, টাকাটা হাতে পেয়েই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল ?

টাকাটা পেয়েই কাজ আরম্ভ করেছে।

সব শুনে নিন। কতবার টেলিফোন করে ডেকেছি, আসেনি। কাল আমি নিজেই বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে আর ব্যাপার বুঝতে। টেলিফোন করে জানিয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আসছি—রাত তখন ন-টা হবে। গিয়ে শুনলাম কী জানেন ? জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে, ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি তো অবাক ! বাড়ির লোকের ব্যবহারও যেন কেমন কেমন লাগল। আমি ঠায় বসে রইলাম অনাদির জন্য, বললাম যে বিশেষ দরকার আছে, যত রাত্রিই হোক অনাদির সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরব। ওর বোন এমন বিশ্রী একটা ঠাট্টা করলে। অথচ আগে আমাকে যে কী খাতিরটাই করত !

মিলনী একটু থামে। সিমেন্ট শিশিরে ভিজে আছে, তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে হয়।

মিলনী বলে, প্রায় এগারোটার সময় ফিরে এল। বেশ বুঝলাম, আমায় ধন্না দিয়ে বসে থাকতে দেখে খুব বিরক্ত হয়েছে। এমনভাবে কথা বলল ব্যবহার করল—একেবারে যেন অন্য মানুষ ! আমি বিদায় নিয়ে রেহাই দিলে যেন বাঁচে। পাঁচ মিনিটেই ব্যাপার কী ভালো করেই বুঝলাম, মাথা ঘুরছিল বলে তাড়াতাড়ি চলেও এলাম।

সুনীল একটু ভেবে বলে, তোমার ভুল হয়নি তো ? হয়তো কোনো মুডে ছিল, কিংবা কিছু একটা ঘটেছে—

মিলনী বলে, ভুল হয়নি। ব্যাপাব ঠিক বুঝে নিয়েছি। কী বুঝতে পাবছি না জানেন ? কী করে এটা সম্ভব হয় !

সুনীল চুপ করে থাকে।

মিলনী ক্ষোভেব সঙ্গে বলে, আমায় বোকাহাবা ভাববেন না—আমি ব্যাবসাদারের মেয়ে। বুড়ো বয়সে স্কুলে মোটে সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছি—এ সব আমাব খেয়াল ছিল।

বিয়ে না করলে টাকাটা ফেবত দেবে।

মিলনী একটু হাসে। ভোরেব অস্পষ্ট আলোয় অদ্ভুত দেখায় তার সেই হাসি।

বলে, রাতে এক মিনিট ঘুমোইনি, শুধু এই কথা ভেবেছি। মুশকিল তো ওইখানেই। টাকা ও ফেরত দেবে না। চেষ্টা কবছে এড়িয়ে যেতে, আমাকে বাদ দিয়ে যদি টাকাটা বাগাতে পারে সেই চেষ্টা কবছে--নইলে অগত্যা বিয়েই করবে আমাকে। বাবা তো আর ছেড়ে কথা কইবে না—চাপ দেবে। টাকা ফিরিয়ে দেবার বদলে তখন আমায় বিয়ে করবে। এ কী বিপদে পড়লাম সুনীলদা ?

খাপছাড়া হাসি দিয়ে আরম্ভ করেছিল, কথার শেষে মিলনী কেঁদে ফেলে।

তাকে সামলে নেবার সময় দিয়ে সুনীল বলে, বিপদ ভাবছ ? এমন বিগড়ে গেছে মন ?

যাবে না ? শুধু টাকার লোভ হলেও কথা ছিল। ও দুর্বলতা অনেকেব আছে, আমার নিজের বাবারও আছে—মেনে নিতাম। কিন্তু বাবাব তো আবও ঢেব টাকা আছে, ভবিষ্যতে বাবাব কাছে আবও কত টাকা পাবার আশা আছে—তবু আমায় চায় না। টাকা এত ভালোবাসে তবু টাকার জন্যেও আমায় নিয়ে ভুগতে ইচ্ছা নেই। এটা কী ভয়ানক কথা বুঝতে পাবছেন না ?

অবিনাশবাবুকে বিয়ে ভেঙে দিতে বলো।

বাবা শুনবে না। এ সব বুঝবেই না বাবা। ও তো বলছে না যে বিয়ে করবে না। এটাই তো ওর চালাকি। বাবা যাতে জোব কবে টাকা ফেরত না চাইতে পারে, আবার বিয়েও ভেঙে যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমি বলতে গেলে বাবা সব আমাব ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেবে। দুদিন আগেও তো আমিই ফুর্তিতে লাফিয়েছি।

সুনীল শান্তভাবে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি সত্যি বোকা নও, অথচ এমনভাবে কী করে তোমায় ভুলিযে এল এতদিন ধরে। তুমি খানিকটা আত্মহারা হয়ে পড়েছিলে।

মিলনী বলে, তা ঠিক।

সুনীল মনে মনে বলে, আত্মহারা হবার কারণটা যদি তুমি বুঝতে। সেকেলে ব্যাবসাদারের একেলে কলেজে পড়া মেয়ে বলেই যে অমন একটি অ্যারিস্টোক্র্যাট বর পাবার নামে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলে এটুকু বুঝলে ভবিষ্যতে কাজ দিত !

মুখে বলে, ভুল যখন করেছ, প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। ব্যাপারটা বুঝুন না বুঝুন, বাবাকে তোমার জানিয়ে দিতে হবে যে এ বিয়ে ভেঙে দিতেই হবে। উনি রাগ করবেন, ঝামেলা হবে—কিন্তু সেটা তোমাকে সইতে হবে।

অনাদিকে একবার বলে দেখব, বাবার টাকাটা ফিরিয়ে দিক, আমায় রেহাই দিক।

বলে দেখতে পারো। তবে টাকার জন্য বিলাতি বিদ্যা নিয়ে বিবেক বিসর্জন দিয়ে এসেছে, বলে কোনো লাভ হবে মনে হয় না। তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই—যতই হোক উঁচুঘরের ভদ্রঘরের ছেলে তো !

বাড়ির দিকে চলতে চলতে মিলনী বলে, বাবা যদি কিছুতেই না বোঝে তাহলে অন্য উপায় দেখতে হবে।

কী উপায় ?

পরে বলব।

সুনীল অস্বস্তিবোধ করে।

বলোই না শুনি ?

আগে ওকে বলে বাবাকে বলে চেষ্টা করে দেখি—কিছু ফল না হলে তখন বলব।

সুনীল অস্বস্তি নিয়েই বাড়ি ফেরে।

মিলনী বুদ্ধিমতী কিন্তু তার মধ্যে দুই স্তরের জীবনেব জোরালো সংঘাত। এই সংঘাত চাপা থাকে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সব মেয়ের মধ্যেই যে সাধারণ বাস্তববোধ থাকে তার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা চালচলনের আড়ালে—সহজে সকলে সন্ধান পায় না।

কিন্তু সে তো জানে ওই সংঘাত মিলনীর মধ্যে কী জোরালো ভাবপ্রবণতা সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ ঝোঁক চাপলে তার বুদ্ধি-বিবেচনা ভেসে যাওয়া আশ্চর্য নয়, ভয়ানক কিছু করে বসা আশ্চর্য নয়।

আজও তার ফুল তোলা হয় না।

৮

আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই লতা উত্তেজিতভাবে বলে, দাদা, সর্বনাশ হয়েছে। মনোজদার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

তার উত্তেজনা লক্ষ করতে করতে সুনীল ব্যাপারটা শোনে।

যখন তখন যে কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হওযাটা লতার পক্ষে অসাধারণ কিছু নয, কিন্তু তার আজকের উত্তেজনা একেবারে অন্য ধরনের। ভযে-ভাবনায় এদিকে মুখখানা তার একেবারে ছোটো হয়ে গেছে।

সাধারণ ঘটনা। মনোজদের কারখানায় হাঙ্গামা হয়েছিল, পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে।

মনোজের মাথায় আঘাত লেগেছে। অন্য কয়েকজন বেশি রকম আহত হয়েছে, মনোজের গুরুতর আঘাত লাগেনি।

হাসপাতালে নয়, বাড়িতেই আছে মনোজ।

দেখতে যাবে না ?

যাব।

একটু থেমে সুনীল জিজ্ঞাসা করে, তোর এখন বুক ধড়ফড় করছে না লতা ?

আচমকা এ প্রশ্ন শুনে লতা একটু ভড়কে গিয়ে বলে, কই না ? বুক ধড়ফড় করবে কেন ?

ভয়ে-ভাবনায় মুখ শুকিয়ে গেছে, এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তবু লতার বুক ধড়ফড় করছে না ! কে জানে সে সত্য কথা বলেছে কি না ?

কিন্তু যদি সত্য কথাই বলে থাকে লতা, তার মানে দাঁড়ায় এই যে শুধু দাদার বাঁশি শুনে তার বুক ধড়ফড় করে, অন্য কোনো কারণে করে না !

জামাকাপড় না ছেড়েই সুনীল মনোজকে দেখতে যায়। মনোজ সম্পর্কে নিজের মনোভাবেরও সে কোনো হদিস পায় না।

বন্ধু হিসাবে মানুষ হিসাবে মনোজ যে তার মনে খুব উঁচু আসন পেয়েছে তা নয়, সাধারণ মানুষ ছাড়া তাকে সে অন্য কিছুই ভাবে না, তবু একটা অসাধারণ আকর্ষণ সে তার জন্য অনুভব করে।

মনোজের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের সম্পর্কে তার স্থায়ী অস্বস্তিবোধটা কীভাবে যেন কেটে যায়।

ব্যাপারটা একেবারেই দুর্বোধ্য তার কাছে। মনোজ যে তার অস্বস্তির কারণটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে তা নয়। সাধারণভাবে দশজনে তাকে যা বলত মনোজও সেই কথাই বলেছে যে তার কোনো অবলম্বন নেই, বউ নেই, সংসার নেই, ধর্মচর্চা জ্ঞানচর্চা খেলাধুলা বা অন্য কোনো নেশা নেই—নিজের মনে নিজেকে নিয়ে থাকে বলে এ রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে, খুঁটিনাটি বিষয়ে মাথা ঘামায়।

একাচোরা মানুষ। তাই শুধু অবলম্বন করেছে বাঁশি। নিজে বাজায় নিজেই শোনে।

কথাটা এত সহজ হলে আর ভাবনার কী ছিল !

কারণ আসল প্রশ্নটা হল যে আর কোনো অবলম্বনের দিকে তার মন যায় না কেন ? বউ-ই বলো আর জ্ঞানচর্চা ধর্মচর্চা তাসপাশার নেশাই বলো, প্রয়োজন হলে আপনা থেকেই মানুষের এ সব কোনো এক দিকে ঝোঁক আসে, মন যায় বলেই মানুষ একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকে।

তার কোনোদিকে মন যায় না কেন ?

মনোজ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কথায়বার্তায় মানুষকে মাতিয়ে রাখতেও সে পটু নয়। তবু তার কাছে এলে ভেতরের একটা ক্ষীণ টনটনে ভাব যেন কমে যায়। অথচ মনোজের কাছে গিয়ে এই স্বস্তিটুকু বোধ করার তেমন তাগিদ যে অনুভব করে তাও নয়।

ভোরে যেদিন মনোজের বাড়ির দিকে বেড়াতে যায় সেদিন তাকে ডেকে তুলে দেবার পর দু চারমিনিট কথা হয়—অন্যদিন হয়তো একবারও দেখাই হয় না তাদের। মনোজ নিজে মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি আসে। কিন্তু মনোজ বাড়িতে এলেও সব দিন সুনীল সে সময় বাড়ি থাকে না।

মনোজের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। বিছানায় বসে বিড়ি টানছিল। আঘাত গুরুতর নয়—তাহলে অবশ্য হাসপাতালেই যেতে হত।

মনোজ একটু হেসে বলে, আয়।

মনোজের মা বলে, এসো বাবা বোসো। অনেকদিন পরে এলে। ওর কাণ্ড দ্যাখো, কোনোদিন এই রকম করে মারা পড়বে।

মনোজ বলে, ভালোই হয়েছে, দুটো দিন একটু বিশ্রাম পাব। সকাল থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত বাইরে কাটে।

অত ধান্ধায় নিজেকে জড়িয়েছিস কেন ?

ধান্ধা আছে তাই জড়িয়েছি। এ তো আর কারও একার শখের ব্যাপার নয়, দশজনের দশরকম বাঁচার লড়াই—আমি বেচারা বাদ থাকব কেন ?

বেচারা নাকি !

মনোজ হেসে বলে, আজকের দিনে কার রেহাই আছে বল ? সবাই জড়িয়ে গেছে, কারও কম কারও বেশি। আমি কি আর বড়ো বড়ো কথা ভেবে যাই ? বাজার করা আপিস করার মতো করতে হয় তাই করি। তুই যে কী করে এ রকম গা বাঁচিয়ে চলিস আমি সত্যি বুঝতে পারি না।

মন যায় না যে।

তাই তো অবাক লাগে !

মনোজের মা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল, চা নিয়ে আসে ঘোমটা-টানা একটি বউ।

মনোজ বলে, অত বড়ো ঘোমটা দিয়ো না, এ আমার অনেক কালের বন্ধু, এক রকম ঘরের লোক। দু-হাতের কাপ দুটি নামিয়ে দিয়ে ঘোমটা কমিয়ে সুনীলের দিকে এক নজর তাকিয়ে সে চলে যায়।

অল্পবয়স, মনোজের সঙ্গে মানায় না। ময়লা রং, মুখের ছাঁদটি সুন্দর।

তাকিয়ে যাবার রকম থেকেই সুনীল টের পায় মেয়েটি বেশ চালাক-চতুর, বয়স কম হলেও হাবাগোবা নয়।

সুনীল বলে, কী ব্যাপার হল ?

মনোজ হেসে বলে, ব্যাপার আবার কী ? আমার লোকের দরকার, ক-মাস পরে আনতাম। তা মেয়েটা একটা বজ্জাতের হাতে যাচ্ছিল, আমিই বিয়ে করে নিয়ে এলাম।

মন গেল ?

মন ? এমনিতে এত তাড়াতাড়ি ফের বিয়ে করতাম না ঠিক। মনটা আজও বড্ড টাটায়। চেনা লোকের মেয়ে, একটা বদলোকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল, নইলে দেরি করতাম, যদ্দিন না মনের ঘা-টা শুকোয়। তা ভেবে দেখলাম কী, বৈরাগ্য তো আর নিইনি, নেবও না, মা একা সামলাতে পারে না, ছেলেমেয়ে দুটো দেখার লোক চাই। দুদিন বাদে সেই বিয়ে করবই, এ মেয়েটাকেই বাঁচিয়ে দিই।

জগতের কথা মনে পড়ে সুনীলের। বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করার অন্য কারণ ছিল জগতের। মনোজের যুক্তিটা কত সহজ ও বাস্তব !

সুনীল বলে, তা ভালোই করেছিস। এত বয়সে দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করেছিস বলে আমি তোকে খোঁচা দেব না। এ রকম হাজার হাজার কচি মেয়ের যে রকম বিয়ে হয়, সে তুলনায় এর তো সুপাত্র জুটেছে, ভালো বিয়ে হয়েছে।

মনোজ খুশি হয়ে বলে, আমি ভাবছিলাম, তুই বুঝি গাল দিবি ! তোর একবার হল না, আমার তিন দফা হয়ে গেল—তাও আবার এত অল্পবয়সি বউ এনেছি !

সুনীল হেসে বলে, গাল দেব না কী করব এই ভয়ে আমায় কিছু বলিসনি তো ? সেটা আমি আগেই বুঝেছি। নইলে এতক্ষণ রক্ষা রাখতাম !

মনোজ একটু হাসে।

ডাক না একটু আলাপ করি ?

দুদিন যাক ভাই। মা চটে যাবে।

সুনীল সায় দিয়ে বলে, সেই ভালো। কিছু কিছু লোক আছে, সে দিনকাল আর নেই বলে যারা শুধু লাফায়—সব কুসংস্কার ভেঙে ফেল। কুসংস্কার ভাঙা ভালো, কিন্তু যা আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছে সেগুলি নিয়ে অনর্থক হাঙ্গামা করে লাভ কী ? ক-দিন আর বাঁচবে তোর মা ? মরলেই তো সব কুসংস্কারও শেষ হয়ে গেল। ওই বুড়িকে ঢেলে সাজাতে চাওয়ার কোনো মানে হয় ?

বাস থেকে নেমে সুনীল একটু দাঁড়ায়।

মিলনী ?

না, মিলনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো তাগিদই ভিতরে নেই। অথচ অনায়াসে কয়েক পা হেঁটে সে মিলনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আসতে পারে। দুদিন আগেও যার সঙ্গে কথা বলতে এত ভালো লাগত !

অনাদিকে ঠেকাবার কী উপায় ঠিক করেছে খুলে না বলুক, সে টের পেয়ে গিয়েছে মিলনীর মনের কথা।

সাধারণ চালচলনে গোপন থাকা মিলনীর ভারপ্রবণতার কথা ভেবে কয়েকদিন সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিল।

অন্য কিছু করা না গেলেও সে কী করবে ভেবে রেখেছে সেটা প্রকাশ করে না বলায় সুনীলের চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

খাপছাড়া কিছু করার কথা না ভেবে থাকলে তার কাছেও খুলে বলে না কেন ?

কয়েক দিন আগে আবার সে মিলনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি শেষ উপায়টা কী ভেবে রেখেছ বললে না তো ?

এবারও মিলনী একই জবাব দিয়েছিল, পরে বলব।

আমাকে বলতে দোষ কী ?

দোষ আছে।

বলে মিলনী একটু হেসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে হাসির মানে সুনীল বুঝতে পারেনি, বুঝতে কিছু সময় লেগেছিল। হাসিটা তার মনে হয়েছিল খাপছাড়া, তাই ভুলতে পারেনি। মিলনীর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পর ওই হাসির চমকপ্রদ মানেটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

অন্য উপায়ে যদি না ঠেকানো যায় অনাদির খপ্পরে গিয়ে পড়া তাহলে সুনীলকে অবলম্বন করে সে এই বিপদ-সমুদ্রে পাড়ি দেবার কথা ভাবছে !

আইনমতে একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে কেউ তো আর তাকে অনাদির সাথে গাঁথতে পারবে না !

মিলনীর চিন্তাধারাও সুনীল অনুমান করতে পারে। অনাদি ভণ্ড প্রতারক। ভালোবাসা দূরে থাক, মিলনীকে সে অপছন্দ করে। এত বেশি অপছন্দ করে যে আরও অনেক বেশি টাকার লোভটাও সে তুচ্ছ করে দিতে পারে তাকে বিয়ে করা থেকে রেহাই পাবার জন্য।

এমনিতে সুনীলকে স্বামী করার সাধ তার নেই। কিন্তু অনাদিকে বিয়ে করার চেয়ে সুনীলকে বিয়ে করা অনেক ভালো।

বাপকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে সুনীলকে বিয়ে করে অনাদির ব্যাপার সে জন্মের মতো চুকিয়ে দেবে।

খুব যে নতুন একটা উপায় মিলনী ঠাউরে রেখেছে তা নয়।

বাধা ডিঙিয়ে ভালোবাসা সার্থক করতে গোপনে বিয়ে চুকিয়ে দেওয়াটা কেবল নাটকে উপন্যাসে নয়, বাস্তব জীবনেও একটা সহজ সাধারণ উপায়।

নিজেকে বেশ খানিকটা বিপন্ন মনে হয় সুনীলের !

এক রকম রাজকন্যাই বলা চলে—রাজা বাপের টাকার হিসাবে। এক গরিবের মেয়েকে একটা বজ্জাতের হাত থেকে বাঁচাতে মনোজ তাকে বিয়ে করেছে বন্ধুবান্ধব কাউকে না জানিয়েই, কিন্তু একজন বিলাতফেরত মস্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিত ছেলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মিলনীকে বিয়ে করা তার উচিত এবং সংগত মনে হবে না তো !

কর্তব্য করছে—নিজেকে এই অজুহাত দেখিয়ে ভেবে শেষ পর্যন্ত সে মিলনীকে বিয়ে করে বসবে না তো ?

সব সমস্যা মিটে যায়!

বাবাকে সে বলতে পারে, তিলে তিলে তোমাকে আর আত্মহত্যা করতে হবে না, চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার তুমি খাও দাও ঘুমাও আর তীর্থ করো।

মা-কে বলতে পারে, রাজকন্যা বউ এনে দিয়েছি, এখন থেকে রাঁধুনি রাঁধবে, চাকরানি বাসন মাজবে—তুমি শুধু খাটে বসে থাকবে আর ঝি-রাঁধুনিদের হুকুম দেবে গরিব ছেলের রাজকন্যা বউয়ের রানি শাশুড়ির মতো।

লতাকে সে বলতে পারে, শাড়ি দেবে গয়না দেবে মোটরে চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াবে সিনেমা দেখাবে এমন ছেলে তোকে এনে দিতে পারি, নয়তো ফেল করে করে সারাজীবন পড়তে চাইলে তোকে পড়াতেও পারি—কোনটা তুই চাস ·

এ কোনো অবাস্তব চিন্তা নয়। মিলনী আইনমতে প্রাপ্তবয়স্কা, কাউকে না জানিয়ে সে যদি আইনমতে তাকে বিয়ে করে, অবিনাশ যতই রাগুক যতই গালাগালি দিক, তাকে জামাই বলে না মেনে তার উপায় থাকবে না। মেয়ের মুখ চেয়ে জামাইকে নিজের আর্থিক স্তরে টেনেও তুলতে হবে তাকে !

তবে তার ভয় কীসের ? নিজেকে বিপন্ন ভাবে কেন ? এমন একটা সুযোগ কি সচরাচর আসে মানুষের জীবনে ? মিলনীকে নিজে চেষ্টা করে দেখার সময় পর্যন্ত না দিয়ে তার বরং তাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলা উচিত যে তাড়াতাড়ি একুশ দিনের নোটিশে তার গলায় মালা দেওয়াই মিলনীর একমাত্র বাঁচবার উপায় !

সুনীল নিজের মনে হাসে।

বড়ো বড়ো ডিগ্রিওলা মহামহাপণ্ডিত অনাদির জীবন-জয়ের চেষ্টার মতোই হবে বইকী তার উদ্‌ভ্রান্তা মিলনীকে ধরে তার নিজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।

মিলনীর মতলব টের পাবার পর থেকে অকারণে যাবার সব তাগিদ ফুরিয়ে গিয়েছে সুনীলের। মুখে কিছুই বলেনি।

কিন্তু মনে মনে কথাটা যে মিলনী ভাবতে পেরেছে এটা কত বড়ো অপমান সুনীলের !

সুনীলকে দিয়ে অনাদিকে ঠেকাবার শেষ উপায়টা ঠাউরে নেবার পর মিলনী যে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, মুখ থেকে কালো ছায়া সরে গেছে, এটা আরও কত বড়ো অপমান !

মিলনী জানে, তাকে বললেই সে তাকে গোপনে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে—এ দিক থেকে তার এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই।

সুনীল ধন্য হয়ে যাবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে। নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করবে।

অপমানের কথা সত্যই কিন্তু এই অপমানের কথা ভেবে সুনীলের গা-জ্বালা করে না।

চিন্তাটা এখনও মিলনীর মনে, তবু তার মনের কথাটা শুধু অনুমান করেই নিজের সঙ্গে তার যে লড়াই শুরু করতে হয়েছে মিলনীর কাছে অপমানিত হয়ে নিজের জীবনের অভাবের সমস্যাগুলি চুকিয়ে দিয়ে আরামে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার লোভটার সঙ্গে—এটা তো আর গোপন বা মিথ্যা নয় তার নিজের কাছে।

মনের কথাটা মিলনী যখন মুখ ফুটে প্রকাশ করবে সে তখন কী করবে কে জানে !

মুদিখানার গগন ডাকে, বাবু শুনছেন ?

ধীরে ধীরে দোকানে ওঠে সুনীল। নানাচিন্তায় সে এমনি তন্ময় হয়েছিল যে গগনের ডাকে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করে।

গগন বলে, আপনার ভাইকে ধারে সিগারেট দিচ্ছি - আপনার ভাই বলেই দিচ্ছি। তবে কিন্তু আপনাকে একটু বলে রাখলাম কথাটা। এ নিয়ে রাগারাগি করবেন না

তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছ গগন।

ও কথা বলবেন না বাবু। আপনার মর্যাদা আমরা জানি। আপনি হাঙ্গামা না ঠেকালে আমরা ডুবে যেতাম।

তাই বুঝি আমি মানা করলেও আমার ভাইকে ধারে সিগারেট খেতে দিয়ে তার শোধ নিচ্ছ ?

গগন সখেদে বলে, কী জানেন, তেল নুন বেচলেও আমরা মানুষ তো ? খানিকটা বুঝি তো মানুষের কারবার ? উপদেশ ভাববেন না বাবু, আপনাকে উপদেশ দেবার সাধ্যি আমার নেই। তবে বিনা বিড়ি-সিগারেটটাও ডালভাতের মতো দরকারি হয়েছে। খালি পেট ভরে খেলেই কি প্রাণী বাঁচে ? বুক ভরে নিশ্বেস নিতে হয় ক্ষণে ক্ষণে ওমনি প্রায় নিশ্বেস নেবার মতো হয়েছে বিড়ি সিগারেট টানা।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখ মুদিওলা গগনের দিকে।

গগন বলে, আপনার ভাই এসে বললে আমি নিজের নামে স্লিপ কেটে ধারে সিগারেট নেব, দাদার কাছে টাকা এনে আমিই শোধ দেব। মিছে কথা বলছে বুঝলাম সুনীলবাবু তবু ধারে সিগারেট দিলাম। আমার লোকসান যায় যাবে। সিগারেট দরকার আপনার ভায়ের। একটা কথা শুধাই আপনাকে, বেয়াদপি ভেবে নিয়ে রাগ করবেন না যেন। ভাইকে সিগ্রেট খাওয়ার হাতখরচাটা দ্যান না কেন ?

হাতখরচ দিই। দু একটা সিগারেট খেয়ে বিড়ি টানলে যথেষ্ট বাঁচিয়ে যায়।

সুনীল চেয়ে দ্যাখে, দোকানের পিছনে বাড়ির ভিতরে যাবার দরজা ফাঁক করে উঁকি মারছে একটি কচি কিশোরী মেয়ের পাকা মুখ।

তার জবাব শুনে মেয়েটি মুখ বাঁকায়।

গগনের মেয়ে সুভদ্রা। তাদের বাড়িতেও কয়েকবার ওকে সে দেখেছে।

প্রথমে ভেবেছিল লতার কাছে আসে এবং ভেবে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল লতার সঙ্গে কথা বলতে আসে মুদিওলা গগনের ওই শিক্ষাদীক্ষায় বাঁধা তা অল্পবয়সে পাকা মেয়ে সুভদ্রা।

ওরা কী কথা বলাবলি করে কে জানে। তারপর লতাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল সুভদ্রা তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে না, আসে অমিয়র কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করতে।

কী পড়ে ?

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক, অঙ্ক লতা হেসেছিল।

সুভদ্রা নিজেই যে শুধু মাঝে মাঝে পড়া বুঝতে আসে তা নয়, অমিয়ও নাকি মাঝে মাঝে গিয়ে ওকে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে আসে।

এতক্ষণ মনে পড়েনি, সুভদ্রাকে দেখে সুনীলের কথাটা খেয়াল হয়

নগদ টাকায় দাম পাবে না জেনেও তার ভাইকে গগনের ধারে সিগারেট খাওয়াবার উদারতার মানেও এতক্ষণে সুনীল বুঝতে পারে।

সিগারেটের দাম গগন অন্যভাবে আদায় করে নিচ্ছে।

সুনীল এক টিপ নস্য নিয়ে বলে, তুমি অনেক বকলে গগন। সংসারে কী জানো, সব কিছু জড়িয়ে আছে। আমার ভাইকে ধারে সিগারেট খাইয়ে তুমি ক দিক সামলাবে ? তার চেয়ে বরং ওকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও। তোমার দোকানেই দাও না ?

গগন আর দরজার আড়ালে সুভদ্রা তাকিয়ে থাকে, সুনীল রাস্তায় নেমে যায়।

লতা জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছে ? মাথা ফেটে গেছে একেবারে ?

না, বেশি লাগেনি। ভালোই আছে, বউ সেবা করছে।

লতা চমকে বলে, বউ ?

আবার বিয়ে করেছে বাঁদরটা। বেশ হয়েছে বউটা, খুব অল্প বয়েস।

ছিছি !

সব কথা শোনার আগেও লতা ছিছি করে, সুনীলের কাছে সব বিবরণ শুনেও লতা ছিছি করে। বলে, ও সব ছুতো সবাই দেয়। যার টাকা আছে সে তাহলে ও রকম দু-চারগণ্ডা মেয়েকে বিয়ে করে বাঁচালে দোষ কি ?

কী ঝাঁঝ লতার কথায় !

কয়েকদিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি।

কীভাবে তরতর করে যে কেটে যায় কাজেব দিনগুলি !

ছুটির দিন মনে প্রশ্ন জাগে, একটানা খেটে যাওয়া ছাড়া জীবন থেকে কী পেলাম এই দিনগুলিতে ?

সকালে রেণু আসে।

প্রায় নির্বিকারভাবে তার হাতে একখানা ছাপা কার্ড তুলে দেয়।

কার্ডটা পড়তে পড়তে কয়েকবার সে মুখ তুলে তাকায কিন্তু রেণুর মুখের ভাব বদলায় না।

রেণুর বিয়ে। একজন অধ্যাপকের সঙ্গে। রেণু তাই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

খানিকক্ষণ তারা বাক্যহারা হয়ে থাকে। সুনীল খবরটা পেয়েছে আচমকা, তার পক্ষে কথা খুঁজে না পাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু রেণু অনেকদিন ভাববার ও অনুভব কবার সময় পেয়েছে. নিজেব বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র তার হাতে দিয়ে কী বলবে ভেবে এসেছে, সে কেন চুপ করে থাকে ? সুনীলই আগে কথা বলে।

আপনিও দলে ভিড়লেন ?

হ্যাঁ, একজনকে বাগাতে পেরেছি।

আপনার সঙ্গে এত ভাব ছিল ভদ্রলোকের, আমার সঙ্গে পরিচয় হল না ?

রেণু ধীরে ধীরে বলে, ভাব বিশেষ ছিল না, অল্পদিনের আলাপ। প্রায় চল্লিশের মতো বয়স হয়েছে, বিয়ে করার কথা ভাবছিল। ক-দিন আলাপ-পবিচয়ের পর একটা প্রস্তাব পেশ কবল। দুজনে ক-দিন আলোচনা করলাম, একটা বোঝাপড়া হল। আমিও বাজি হযে গেলাম। এই আর কী ব্যাপার !

মানুষটাকে চিনি না, তাই জিজ্ঞেস করছি বোঝাপড়া টিকবে তো ?

তা টিকবে। কচিখুকি তো নই, প্রেমেও পড়িনি যে মাথা গুলিয়ে ভুল করে বসব।

আবার দুজনে খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থাকে। সুনীল আচমকা বলে, মিলনীর বিয়েটা বোধ হয় ভেঙে যাবে।

রেণু আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন ?

সুনীল তাকে সব শোনায়। শুনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে রেণু বলে, এ সব ছেলেমানুষি কথা। সে ধাঁচের লোকই নয় অনাদিবাবু।

টাকাটা নিয়েই তবে এ রকম ব্যবহার আরম্ভ করল কেন ?

কোনো একটা কারণ আছে নিশ্চয়। মিলনী বাড়িয়ে বলেছে। এর মধ্যে একদিন অনাদিবাবু এসে সব মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।

রেণুর এতখানি বিশ্বাস অনাদির উপর ?

সুনীল টের পায় অনাদি সম্পর্কে মিলনীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তার মনে এখনও অনেক খটকা আছে, রেণুর কথায় আরও জোরালো হয়ে উঠেছে খটকাগুলি।

সত্যই তো। অনাদিকে কী করে এত নীচ ভাবা যায় ?

পরিষ্কার ব্যাপার, বাস্তব ঘটনা।

অথচ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

নিজের ধারণা বিশ্বাস বিচারবুদ্ধি সব কিছুর বিরুদ্ধে যাচ্ছে ঘটনাটা—হিসাব করলে যা অসম্ভব বলে গণ্য করা যায় তাই যেন বাস্তবে সম্ভব হয়েছে।

অনাদির পক্ষে কী করে সম্ভব মিলনীকে এতদিন এভাবে ধাপ্পা দিয়ে আসা এবং তার কাছেও নিজেকে তেজি ন্যায়নিষ্ঠ শক্ত মানুষ হিসাবে নিজেকে এতদিন খাড়া করে রাখা ?

এতখানি নীচতা যার মধ্যে আছে তাকে কী করে এতদিন মহৎ মানুষ বলে সে ভুল করে এল ? দেশেবিদেশে বিদ্যা অর্জন করে কী এমনি চোখা হয়েছে অনাদির মতলববাজির বুদ্ধি আর হৃদয় থেকে এতখানি মিলিয়ে গেছে ন্যায় অন্যায়ের বোধ যে অনায়াসে এমন সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে সে শিক্ষিত মহৎ মানুষের অভিনয় করে সকলকে ঠকাতে পারে ?

অনাদির টাকা নেওয়ার প্রশ্নটা মিলনীও বড়ো করেনি, সুনীলের কাছেও কথাটা গুরুতর নয়।

এ কথা তো স্থির করাই ছিল যে বিয়ের আগে সে যৌতুকের টাকাটা নেবে, পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করে কিছু কিছু উপার্জন হতে আরম্ভ হলে তাদের বিয়ে হবে।

ঠিক কথাই । দেশ বিদেশে সঞ্চয় করা বিদ্যা দিয়ে তো পেট ভরে না মানুষের।

বাড়ির অবস্থা ভালোই অনাদির। বিদেশ ঘুরিয়ে তাকে বিদ্বান করে আনতে এত পয়সা ঢালার পর আরও দু-একবছর তাকে এবং তার বউকে খেতে পরতে দিতে হলে বরং কৃতার্থই হয়ে যেত বাড়ির লোকেরা।

কিন্তু সে ব্যবস্থায় অনাদি রাজি হয়নি। উপার্জন সে করবে জানা কথাই। তবু উপার্জনের ব্যবস্থা ঠিক করে উপার্জন আরম্ভ করার আগে সে বিয়ে করবে না।

তার এই তেজ আর আত্মসম্মানবোধ মিলনীর মধ্যে শ্রদ্ধাই জাগিয়েছিল।

এ সবও তবে তার অভিনয় ?

টাকাটা বাগিয়ে নিয়েই মিলনীর সঙ্গে একেবারে উলটো ব্যবহার শুরু করে দেওয়া সত্যই তাহলে কত বড়ো বজ্জাতির পরিচয় অনাদির ? অনেকদিন ধরে ফন্দি আঁটা বজ্জাতির পরিচয় ?

তাকে এ রকম সাংঘাতিক লোক বলে জেনে, আগাগোড়া শুধু টাকাটা বাগাবার জন্যই সে ভালোবাসার ভান করে এসেছে জেনে, ওই মানুষটার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবার ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করে মিলনী যদি নিজেই বিয়ে ভেঙে দেয়,—টাকাটা সে মফতে পেয়ে যাবে, মিলনীর দায়ও ঘাড়ে নিতে হবে না !

মিলনীর দায় !

কথাটার মানে তলিয়ে ভাবতে গিয়ে মাথা যেন ঘুরে যায় সুনীলের !

অবিনাশের আরও অনেক টাকা আছে, মিলনীকে বিয়ে করলে আরও টাকা আদায় করার সুযোগ পাবে—কিন্তু সে সুযোগও অনাদি চায় না।

অর্থাৎ মিলনীকে সে চায় না। মিলনীর দায় সে টাকার খাতিরেও ঘাড়ে নিতে অনিচ্ছুক। যৌতুকের টাকাটা বাগাতে পারলেই সে খুশি।

অবিনাশের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ্য আরও অবাস্তব হয়ে ওঠে সুনীলের কাছে।

অবিনাশকে সে বলে, বিয়ের আগে এতগুলি টাকা অনাদিকে দেওয়া কি ঠিক হল?

অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন?

টাকাটা নিয়ে যদি গোলমাল করে?

অবিনাশ হেসে বলে, কী গোলমাল করবে?

যদি বিয়ে না করতে চায়?

অবিনাশ আরও আশ্চর্য হয়ে বলে, বিয়ে করতে চায় বলেই যে তুকের টাকাটা আগাম নিয়েছে, যদি বিয়ে করতে না চায় মানে? তুমি কী বলতে চাইছ মোটেই বুঝতে পারছি না।

সুনীল তখন আর দ্বিধা না করে মিলনীকে বিয়ে করতে অনাদির অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করে।

অবিনাশ কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে বলে, কে বললে তোমায় অনাদি মিলনীকে বিয়ে করতে চায় না?

ওর ব্যবহার থেকে বোঝা যাচ্ছে। টাকাটা নেবার পর মিলনীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না।

ভালো ব্যবহার করছে না অর্থ কী?

আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। মিলনীর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে না।

অবিনাশ একটু হাসে।

কে জানে মান-অভিমানের কী ব্যাপার হয়েছে ওদের মধ্যে। সে ওরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেবে। তার মানে বুঝি তোমরা ধরে নিয়েছ অনাদি টাকাটা নিয়ে এখন বিয়ে করতে চায় না? আমায় কি তোমরা এমনই বোকা পেয়েছ, ও রকম একটা বদলোকের কাছে মেয়ে দেব? আমার মেয়েকে চায় না শুধু আমার টাকা চায়—এ রকম জামাই আমার আমি? মানুষ চেনার ক্ষমতা একটু আছে আমার, নইলে আর এই বাজারে কারবার করে খেতে হত না।

অবিনাশও এতখানি বিশ্বাস করে অনাদিকে।

তবে এ কথাও তো সত্য যে অনাদিকে বিশ্বাস না করলে তাকে টাকা আর মেয়ে দিতেই বা সে রাজি হবে কেন। সে তো কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন মানুষ নয়।

সুনীল তবু ইতস্তত করে বলে, বিয়ের পর যদি খারাপ ব্যবহার করে?

অবিনাশ বলে, তোমরা বড়ো ছেলেমানুষ। খারাপ ব্যবহার করবে কেন? মিলনীকে পছন্দ করে বিয়ে করছে ওর সঙ্গে বনবে না জানা থাকলে অনাদি কখনোই রাজি হত না। খারাপ ব্যবহারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমার মেয়ের যদি কোনো দোষ থাকে, অনাদি সেটা সংশোধন করা দরকার মনে করে, সে জন্য একটু শক্ত হতে পারে। সে তো ভালো কথাই। সেটুকু অধিকার স্বামীর থাকবে না?

মনোজও তার কাছে সব শুনে বলে, আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপার। ও রকম শিক্ষিত মার্জিত বিবেচক মানুষ, সকলের সঙ্গে এমন সুন্দর কথা ব্যবহার, মিলনীর সঙ্গে এত ভাব—সে এ রকম একটা কাণ্ড করে বসবে? আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।

রেণু অবিনাশ আর মনোজের কথায় আরও মাথা ঘুরে যায় বলে সুনীল একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত করে বসে।

নিজে সে অনাদির কাছে যাবে। ব্যাপার বুঝে আসার চেষ্টা করবে।

অনাদির বাড়িতে এই তার প্রথম যাওয়া। বাড়িটা দেখেই সে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। বেশ বড়ো বাড়ি, পুরানো আভিজাত্যের ছাপ আছে বাড়িটাতে কিন্তু সেটাও একেবারে সেকেলে আভিজাত্য।

বাড়ির সামনে ছোটো একটা বাগান। সেই বাগানে গাছের ডাল টেনে নুইয়ে পেয়ারা পাড়ছিল একটি তরুণী মেয়ে।

বাড়ির চেহারা যতই সেকেলে হোক, মেয়েটির পুরোমাত্রায় আধুনিক বেশ। তাই দ্বিধা না করেই সুনীল অনাদিকে ডেকে দেবার কথা বলতে তার দিকে এগিয়ে যায়।

পেয়ারা গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি চলে যায় বাড়ির ভিতরে।

খানিক পরে বেরিয়ে আসে মিহি ধুতি ও গলাবন্ধ কোট পরা বড়ো এক ভদ্রলোক। সুনীলের অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে ভদ্রলোক অনাদির বাবা।

আরেকটা কথা অনুমান করতেও তার দেরি হয় না যে অনাদিদের পরিবারটি সম্পর্কে তার যে ধারণা ছিল সেটা ঠিক নয়।

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার কিন্তু পরিবারটিকে আধুনিক বলা যায় না সেদিক থেকেই।

কাকে চান ?

অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

ঘরে এসে বসুন।

অনাদির বাবার কথা বলার ধরনটা ধীর স্থির অমায়িক। ধীরে ধীরে স্থিরপদে চলা। এ যুগের জীবনের তীব্র গতিশীলতা যেন নাগাল পায়নি অনাদির বাবার।

অনাদি ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে দেখা যায় বাড়িতে সেও ধীর স্থির গম্ভীর।

হাসিমুখে না হলেও অমায়িকভাবেই সে বলে, আসুন, আসুন। কী খবর সুনীলবাবু ?

খবর আপনি বলবেন। আমি শুধু জানতে এসেছি।

বসুন। কী খবর জানতে চান ?

সুনীল বড়োই বিপন্নবোধ করে। এতক্ষণে সে টের পেয়েছে কতখানি দুঃসাহসে ভর করে সে নাক গলাতে এসেছে অনাদির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে— আত্মীয় বা বন্ধু না হয়েই।

বাড়ি বয়ে এসে গায়ে পড়ে অপমান করার জন্য ইচ্ছা করলেই অনাদি রেগে উঠতে পারে, গালাগালি দিয়ে অপমান করে তাকে দূর করে দিতে পারে বাড়ি থেকে।

তার কিছুই বলার বা করার থাকবে না।

তবে অনাদি জানে মিলনীর সে বন্ধু, শ্রদ্ধেয় বন্ধু। এইটুকুই শুধু তার ভরসা।

একেবারে সোজাসুজি খোলাখুলি কথা বলি অনাদিবাবু ?

অনাদি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুখে কিছুই বলে না। কোন ব্যাপারে সে এসেছে সেটা খানিকটা যে অনাদি অনুমান করতে পেরেছে সেটা আশ্চর্য নয়।

সুনীল আবার বলে, আপনি বুঝতেই পারছেন আপনার পক্ষের কী খবর জানতে এসেছি। খোলাখুলি কথা না বললে কথা পেড়ে কোনো লাভ নেই। একবার ভেবে দেখুন। আমি সমালোচনা করতে আসিনি—সে অধিকার যে আমার নেই আমি ভালো করেই তা জানি। আমি শুধু ব্যাপারটা জানতে বুঝতে এসেছি। যদি আমার নাক গলানো পছন্দ না করেন- আগেই সেটা জানিয়ে দিলে ভালো হয়। আসল কথা না পেড়ে দু চারমিনিট এ কথা ও কথা বলে আমি বিদায় নিতে পারি।

মিলনী কি আপনাকে পাঠিয়েছে ?

না। তবে আমি ওর পক্ষ থেকেই আসছি। ব্যাপার যা বুঝব হয়তো ওকে বলতে হবে—অবশ্য যদি দরকার হয়।

আপনি ভারী চালাক মানুষ সুনীলবাবু।

বোকা নই, এটুকু জানি।

অনাদি খানিক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, বেশ, কী বলবেন বলুন। খোলাখুলি কথাই হবে। তাড়াহুড়ো করবেন না, চা আনতে বলি।

চা-খাবার এনে দেয় বাগানের সেই অবিবাহিতা মেয়েটি, তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই যে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিল। অপরিচিত লোকের সঙ্গে সে কথা বলে না, কিন্তু মানুষটা দাদার পরিচিত জানবার পর চা-খাবার দিতে অনায়াসেই সামনে আসে।

তার মুখের ক্লিষ্টতার ছাপটা সুনীলের খুবই চেনা।

সাধারণ সেকেলে মধ্যবিত্ত পরিবারের একেলে হয়ে উঠতে খুব বেশি হাঙ্গামা হয় না, কিন্তু এ রকম সেকেলে অভিজাত পরিবারের একেলে হওয়াটা বড়োই কষ্টকর প্রক্রিয়া। কত কিছু যে ভাঙতে হয়, ভেঙে যেতে দিতে হয় !

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে কথা তোলে।

মিলনী বলছিল, টাকাটা বাগিয়ে নিয়েই আপনি ওকে অবহেলা করছেন।

সে তো মিলনী বলবেই।

ওর কী দোষ ? টাকাটা নেবার আগে এক রকম ব্যবহার করছিলেন, টাকাটা নেবার পরেই একেবারে অন্য রকম হয়ে গেলেন। মিলনীর তো এ রকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে টাকাটা বাগিয়ে নিয়ে আপনি এখন ওকে—

সুনীল কথাটা শেষ করে না।

অনাদি চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে সুনীল আবার বলে, আমাদের মনেও খটকা লেগেছে। একটা তো মানে আছে আপনার টাকা নিয়েই দুর্ব্যবহার শুরু করাব ?

দুর্ব্যবহার ?

মিলনী তাই বলছে।

অনাদি বলে, সোজা সহজ ব্যাপারে মিলনী এত রং চড়াতে চাইলে আমি কী করব বলুন ? যেতে বলেছে যাইনি—ব্যস্ত আছি, কিন্তু ঠিক সে জন্য নয়। আমি অন প্রিনসিপল যাইনি, যাওয়া উচিত নয় বলে যাইনি। মিলনী ধরে নিয়েছে, এটা বুঝি আমাদের ভালোবাসার বিয়ে—আমরা দুজনেই সব ব্যবস্থা করছি। আসলে এটা আর দশটা সাধারণ বিযেব মতোই ব্যাপার—বরপক্ষ কন্যাপক্ষ দরদস্তুর ঠিকঠাক করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। যৌতুকের টাকাটা আমি বিয়ের আগে নিয়েছি। অনেকেই এ রকম নেয়।

ভালোবাসার বিয়ে নয় ?

নিশ্চয় নয়। ওর বাবা আগে আমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, সব ঠিকঠাক করেছেন,—তারপর আমায় ডেকে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। আগে ছিল কনে দেখা, আজকাল একটু রকমফের হয়েছে। একদিন কনে দেখে পছন্দ-অপছন্দের বদলে দু-চারদিন মেলামেশা করতে দেওয়া।

তর্কের কথা নয়, বুঝবার কথা। মনে মনে অনাদির কথাগুলির সঙ্গে নিজের ধারণা ও বিশ্বাসগুলিকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে সুনীল বলে, বেশ তো। তাই নয় হল। এটা ভালোবাসার

বিয়ে নয়। এতদিন প্রায়ই দেখা করতেন, যৌতুকটা নিয়েই কেন একেবারে আড়ালে ঠেলে দিলেন মিলনীকে ?

সেটাই নিয়ম বলে। কনে দেখা হয়েছে, পছন্দ করা হয়েছে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এখন আবার কেন কনের সঙ্গে আগের মতো মেলামেশা চালাব ?

বুঝতে পারলাম না।

কী করে বুঝবেন ? আপনারা ধরে নিয়েছেন আমাদের বিয়েটা একটা রোমাঞ্চকর রোমান্সের ব্যাপার। শুধু আমার আর মিলনীর ব্যাপার, আর কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা সব ব্যাপার জানেন না, আমাদের মেলামেশা দেখে আপনারা ও রকম মনে করলেও করতে পারেন। কিন্তু সব জেনেও মিলনী এ রকম ভাবে কেন ? বিয়ের আয়োজনটা করেছে দুটো পরিবারে—বিয়ের পর মিলনীকে নিয়ে আমি ভিন্ন ঘর বাঁধব না —বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি এসে ওকে বউ সেজে ঘরকন্না করতে হবে।

সুনীল অনাদির দেওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে বলে, মিলনীকে কিছু না জানিয়ে যৌতুকের টাকাটা নিলেন কেন ?

ওকে জানাব কেন ? কনের সঙ্গে পরামর্শ করে কেউ বিয়ের যৌতুক নেয় নাকি ?

কনে কিন্তু জানতে পাবে। বাপের কত টাকা যাচ্ছে, কখন কীভাবে যাচ্ছে—

মিলনীও ইচ্ছা করলেই জানতে পাবে। আমরা বাপব্যাটা মিলে দলিলে সই করে ওর বাবার কাছে টাকা নিয়েছি—দলিলটা দেখতে চাইলেই হয়।

দলিল ?

আইনসঙ্গত কনট্রাক্ট। মিলনীকে বলবেন, ন্যাকামি না করে কী রকম দলিল সই করে টাকাটা নিয়েছি যেন বাপের কাছে জানবার চেষ্টা করে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে অনাদি যোগ দেয়, বাপ দলিলে সই করাবে, মেয়ে করবে ন্যাকামি। আমার তো একটা বিচার-বিবেচনা আছে ? ভবিষ্যতের হিসাবনিকাশ আছে ? এ রকম একটা মিথ্যা ধারণা বজায় থাকলে কত রকম অসম্ভব অবাস্তব প্রত্যাশা জাগবে, সে সব যখন মিটবে না—আমাদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ? আমরা সাধারণভাবে মেলামেশা আলাপ-আলোচনা করেছি--তার ফলে যদি দুজনের ভালোবাসা জন্মেই থাকে– জন্মেছে। কিন্তু আর সবকিছু ছোটো করে ওটাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার উপায় তো আমাদের নেই। আমাদের সাধারণ বিয়ে– ভালোবাসার অত মিথ্যে রং চড়ালে আমাদের চলবে কেন ?

মিলনীকে এ সব বুঝিয়ে বলেননি কেন ?

বুঝিয়ে দেবার জন্যই ওর ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করেছি। বলার চেয়ে এতে আরও ভালো করে বুঝবে।

একটু থেমে সে যোগ দেয়, ওকে এটা বোঝানো দরকার না হলে কঠোরভাবে নিয়মটা পালন করতাম না—মেলামেশা কমিয়ে দিলেও বজায় রাখতাম।

সুনীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, মিলনীর ন্যাকামির কথা বলছেন। যার ন্যাকামি পছন্দ হয় না, তাকে নিয়ে কী করে সুখী হবেন ?

অনাদি একটু হেসে বলে, এ সব ছেলেমানুষিপনার ন্যাকামি—ভুল ধারণার ন্যাকামি। ভুল ধারণা শুধরে দিলেই এ সব ছেলেমানুষি সেরে যাবে। আমরা সুখী হব না কেন ? পরস্পরকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। হয়তো ভালোবাসাও জন্মেছে। আমি তো আর সেটা অস্বীকার করছি না ! তবে মানিয়ে চলতে হবে, ভালোবাসার নামে ন্যাকামি চলবে না।

সুনীল বলে, ও !

অনাদির কথা শুনে এবার মনে মনে হাসবে না গম্ভীর হবে সুনীল ভেবে পায় না।

একবার অনাদির বিচারবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়, আবার মনে হয় সবটাই তার ছেলেমানুষি, ন্যাকামি।

হয়তো মিলনীর চেয়েও রোমান্সের রোমাঞ্চ অনাদি বেশি চায়—সাধারণ রোমান্স একঘেয়ে হয়ে গেছে বলে একটু বাঁকাপথে নাটকীয়ভাবে রোমান্সের ব্যবস্থা করেছে।

মিলনীর প্রাণপণ চেষ্টা তাদের বিয়েটাকে ভালোবাসার বিয়েতে দাঁড় করানো।

অনাদির প্রাণপণ চেষ্টা তার এই ন্যাকামিকে এতটুকু প্রশ্রয় না দেওয়া।

গুরুজনদের ঘটকালিতে তাদের সাধারণ চলতি বিয়ে।

উভয়পক্ষে দরদস্তুর করে যৌতুক ইত্যাদি স্থির করে নিয়ে ব্যবস্থা করা বিয়ে।

এর মধ্যে প্রেমের প্রশ্নই ওঠে না।

একটু ব্যতিক্রম শুধু করা হয়েছে এই যে একদিন আধঘণ্টা দেখাশোনা জিজ্ঞাসাবাদ পরীক্ষা নিরীক্ষার বদলে কিছুদিন স্বাধীনভাবে পরস্পরের মেলামেশার মধ্যে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করা। অনাদিই নাকি এটা দাবি করেছিল।

পরস্পরকে কেন তবে তারা পছন্দ করল?

অনাদি অমানুষ নয়। যৌতুকটা তার কাছে প্রধান নয়।

মিলনীর ন্যাকামিপনা তার সয় না, তবু সে ওই মিলনীকেই পছন্দ করেছে।

অনাদি যৌতুক নিয়ে তাকে বিয়ে করবে জেনেও মিলনী তাকে পছন্দ করেছে।

দুজনের চরম অমিল।

তবু তারা মিলতে চায়।

নীতি নিয়ম রুচি প্রকৃতিতে তাদের বিরোধ, কাব্যিক ভালোবাসা কুৎসিত হয়ে গেছে তাদের জীবনে—তবু তারা আনুষ্ঠানিক প্রথায় মিলতে চায়।

কেন এটা ভালোবাসা নয়?

রাত দশটা বাজে।

খিদেয় পেট জ্বলছে।

লতা খেতে ডাকতে এলে সুনীল বলে, একটা খাম পোস্টকার্ড দিতে পারিস?

নেই তো দাদা।

বাড়িতে খাম পোস্টকার্ডও থাকে না?

থাকলেই থাকে। তোমরা এনে রাখবে না তবু থাকবে কী করে? সেনেদের বাড়ি থেকে খাম চেয়ে কিনে নিয়ে এলাম, তবে বাবা জরুরি চিঠিখানা লিখল।

লতা একটু হাসে।

ওরা কিছুতে দাম নেবে না—আমিও কিছুতে দুআনা না দিয়ে খামটা নেব না। খামের দামটা নিয়ে সে যে কী এক লড়াই হল কী বলব তোমাকে।

সুনীল জিজ্ঞাসা করে, বাবার হঠাৎ জরুরি চিঠি লেখা দরকার হল কেন?

তোমার জন্য দরকার হল। সতেরো-শো টাকা নগদ দেবে, তেরো ভরির গয়না দেবে। মেয়ে দেখতে সুন্দর, স্কুলে পড়ে আবার গানও জানে।

সুনীল হাসিমুখেই বলে, খিদে পেয়েছে। ইয়ার্কি না দিয়ে জায়গা করবি যা তো?

খুঁজে পেতে একটা পুরানো ময়লা সাদা খাম সে জোগাড় করে। লতার অঙ্কের খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মিলনীকে চিঠি লেখে।

লেখে :

অনাদি তোমায় ভালোবাসে। তুমিও অনাদিকে ভালোবাস। নিজেরা বুঝেশুনে ব্যবস্থা করো। আমার কিছু বলারও নেই, করারও নেই।

বাড়িতে খাম না থাকায় বিযাবিং চিঠি দিলাম।

খামে ডানদিকে মিলনীর ঠিকানা লিখে সুনীল বাঁদিকে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম ঠিকানাটা লিখে দেয়।

কার চিঠি না জানলে মিলনী হয়তো ডবল দাম দিয়ে বিযাবিং চিঠিটা নিতে অস্বীকার করতেও পারে।

চালচলন পাণ্ডুলিপি চিত্র